বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আপীল বিভাগ

উপস্থিত

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, প্রধান বিচারপতি,
বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী,
বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী,
বিচারপতি মির্জা হোসাইন হায়দার,
বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিক,
বিচারপতি মোঃ নূরুজ্জামান,
বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

ফৌজদারি রিভিউ পিটিশন নং ৮২/২০১৭

(ফৌজদারী আপিল নং ১৫/২০১০ এর ১৪.০২.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত)

আতাউর মৃধা ওরফে আতাউর ..... পিটিশনার।

= বনাম=

রাষ্ট্র ..... রেসপনডেন্ট।

পিটিশনার পক্ষে	জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন, সিনিয়র অ্যাডভোকেট ইন্সট্রাক্টেড বাই অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড জনাব সৈয়দ মাহবুবর রহমান।
রেস্পন্ডেন্ট পক্ষে:	অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম (প্রয়াত), অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এ এম আমিনউদ্দিন, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব বিশ্বজিৎ দেবনাথ, (ইন্সট্রাক্টেড বাই অ্যাডভোকেট অন-রেকর্ড জনাব হরিদাস পাল।)

আদালতে সহায়তা করার জন্য অ্যামিক্যাস কিউরি হিসাবে:

জনাব রোকনউদ্দিন মাহমুদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট,
জনাব এ এফ হাসান আরিফ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট
এবং জনাব আবদুর রাজ্জাক খান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট ।

শুনানির তারিখ : ২০.০৬.২০১৯, ১১.০৭.২০১৯, ২৪.১১.২০২০।

রায়ের তারিখ : ০১.১২.২০২০

রায়

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, প্রধান বিচারপতি

আমার ভ্রাতা বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর লেখা রায় পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশনে বৃহৎ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। আমি বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর লেখা রায় ও আদেশের সাথে একমত হয়ে কিছু বিষয় যুক্ত করতে চাই।

মামলার ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে পুরোপুরি বর্ণিত হয়েছে। তাই, আমি, সে বিষয়সমূহ পুনরাবৃত্তি করছি না।

এই ফৌজদারি রিভিউ পিটিশনের মূল প্রশ্নটি হলো পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, প্রিজনস অ্যাক্ট এবং জেল কোডের বিধান অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে কী বোঝায়।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রাথমিক অর্থ পুরো অবশিষ্ট জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা। 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' শব্দটি পেনাল কোডসহ কোনও আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় নিম্নলিখিতভাবে 'জীবন' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

> "৪৫। প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনও কিছু না বোঝালে 'জীবন' বলতে মানুষের জীবনকে বোঝায়।"

পেনাল কোডের ৫৩ ধারায় বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পেনাল কোডের ৫৩ ধারাটি নিম্নরূপ:

> "৫৩. শাস্তিসমূহ এই বিধির বিধানসমূহ অনুযায়ী অপরাধী যে যে দণ্ডে দণ্ডিত হবে তা হচ্ছেঃ-
>
> প্রথমতঃ মৃত্যু ,
>
> দ্বিতীয়ত,-যাবজ্জীবন কারাদণ্ড;
>
> তৃতীয়ত,-The Criminal Law (Extinction of Discriminatory Privileges) Act 1949 (Act No. II of 1950].দ্বারা বিলুপ্ত।
>
> চতুর্থত,-কারাবাস। যা দুই প্রকারের, যথা:-
>
> (১) সশ্রম, অর্থাৎ কঠোর শ্রম সহকারে
>
> (২) বিনাশ্রম;

পঞ্চমতঃ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ;

ষষ্ঠ,- অর্থদণ্ড ।

ব্যাখ্যা- যাবজ্জীবন কারাবাসের ক্ষেত্রে কারাবাস সশ্রম হবে।”

পেনাল কোডের ৫৩ ধারাটি ভারতীয় পেনাল কোডের ৫৩ ধারার প্রায় অনুরূপ, তবে পেনাল কোডের ৫৩ ধারায় বর্ণিত ব্যাখ্যাটি ভারতীয় পেনাল কোডের ৫৩ ধারায় সংযুক্ত করা হয়নি। পেনাল কোডের ৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ অনূর্ধ ২০ বছরে কমিয়ে আনার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। অন্যদিকে, ভারত সরকারের উভয় বর্ণনার ১৪ বছরের বেশি নয় এমন যেকোনো মেয়াদে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হ্রাস করার ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও এটি ১৪ বছর ছিল তবে ১৯৮৫ সালে পেনাল কোড (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ (১৯৮৫ এর অধ্যাদেশ নং- XLI) ১৪ বছরের স্থলে ২০ বছর প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য পেনাল কোডের ৫৫ ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

> "৫৫. যাবজ্জীবন কারাদন্ড হ্রাসকরণ- যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধীর সম্মতি ছাড়াই, এই দণ্ড অনূর্ধ ২০ বছর মেয়াদী যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে পরিণত করতে পারে "

পেনাল কোডের ৫৭ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসেবে গণনা করা যাবে। ভারতীয় পেনাল কোডের ৫৭ ধারার ভাষা প্রায় একই রকম তবে ভারতে এই সময়কাল ২০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসাবে গণ্য হয়। আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, আমাদের পেনাল কোডের ৫৭ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

> "৫৭. দন্ডের মেয়াদের অংশ- দণ্ডের মেয়াদের অংশ হিসাব করার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ত্রিশ বছরের মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা হবে।"

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থবহ ব্যাখ্যা দেওয়ার লক্ষ্যে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের কিছু বিধান বিবেচনা করাও দরকার।

প্রাথমিকভাবে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে ৩৫ক ধারা সংযোজনের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে যা মূল কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা প্রথমে ১৯৯১ সালের ১২ নং অধ্যাদেশ দ্বারা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর সংশোধনের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের আইন নং V) সংশোধন আইনে পরিণত হয়েছিল। ১৯৯১ সালের অধ্যাদেশ নং ১২ দ্বারা প্রবর্তিত তৎকালীন ৩৫ক ধারাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

> "৩৫ক দণ্ডিত ব্যক্তি হাজতে থাকলে কারাদণ্ডের মেয়াদ- যেক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সময় হাজতে থাকে এবং যে অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় সেটি

> মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয়, সেক্ষেত্রে আদালত কারাদন্ডাদেশ দেওয়ার সময়, পূর্বে যে মেয়াদে সে হাজতে ছিল তা বিবেচনা করতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে আইনে সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকলে, সাজা সেই সময়ের চেয়ে কম হবে না।"

অধ্যাদেশটি ১৯৯১ সালের ১৬ নং আইন দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল তবে আইন প্রণয়নের সময় ৩৫ক ধারায় সংযুক্ত শর্তাংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ১৬ নং আইন দ্বারা প্রবর্তিত কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যখন কোনও অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় বা এমন অপরাধে সাজা দেওয়া হয় যা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়, তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও সাজার পূর্বে যে সময়কাল হাজতে ছিলেন, তা সাজার মেয়াদ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। ১৯৯১ সালের ১৬ নং আইন দ্বারা প্রবর্তিত ৩৫ক ধারা আদালতকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে দোষী ব্যক্তির হাজতকালের ধারাবাহিকতা বিবেচনার জন্য স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করে তবে শর্ত থাকে যে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা যাবে না।

ভারতে, ১৯৭৩ সালের ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের একই রকম ধারাটি ৪২৮ যা নিম্নরূপঃ

> "৪২৮. অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজতবাসের মেয়াদ কারাদণ্ড থেকে বাদ যাবেঃ -যেক্ষেত্রে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে যা জরিমানা প্রদানে ব্যর্থতার কারাদণ্ড নয়, সেক্ষেত্রে তদন্ত, অনুসন্ধান বা বিচার চলাকালীন এবং এই জাতীয় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখের পূর্বে ঐ ব্যক্তির হাজতবাসের সময়কাল, যদি থাকে, তা কারাবাসের মেয়াদ থেকে বাদ (সেট-অফ) যাবে এবং এইরূপ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এই ব্যক্তির কারাদণ্ডের দায়বদ্ধতা তার উপর আরোপিত কারাবাসের মেয়াদে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে ৪৩৩এ তে বর্ণিত মামলার ক্ষেত্রে এই ধরনের হাজতবাস চৌদ্দ বছরের সময়কাল থেকে বাদ যাবে।"

ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারা পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে তদন্ত, অনুসন্ধান বা বিচার চলাকালীন সময়ে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির ভোগকৃত হাজতবাস দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তার উপর আরোপিত কারাদণ্ডের মেয়াদ থেকে বাদ (সেট-অফ) যাবে। ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারার সুবিধা পাওয়ার অধিকার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত সহ অন্য যে কোন অপরাধী ভোগ করতে পারবে। অপরাধীকে সেট-অফ দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে দোষী ব্যক্তির হাজতবাসের সময়কাল আবশ্যিকভাবে তার কারাবাসের মেয়াদ থেকে বাদ (সেট-অফ) যাবে। এই ধারার শর্তাংশে বলা হয়েছে ধারা ৪৩৩এ-তে বর্ণিত ১৪ বছরের সময়কাল হতে এই জাতীয় হাজতবাস বাদ (সেট-অফ) যাবে। ২০০৫ সালে ৪২৮ ধারা যুক্ত করার পূর্বে ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ নং ধারায় "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দটি সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল। Kartar Singh and Others Vs.

State of Haryana, AIR 1982 SC 1439 মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারায় বর্নিত সেট-অফের সুবিধা পাবে না। তবে এই সিদ্ধান্তটি পরবর্তীতে Bhagirath and others Vs. Delhi Administration, AIR 1985 SC 1050 মামলায় বাতিল হয়েছিল। আদালত এই অভিমত ব্যক্ত করেন,

৫. "আমরা পরিষ্কারভাবে বিশ্বাস করি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল প্রশ্ন হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড কিনা। এটা বিবেচনা করতে হবে কারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড নয়, যা নির্দিষ্টভাবে কেবল ছয় মাস, দুই বছর, পাঁচ বছর বা এরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত । যেহেতু Gopal Vinayak Godse v. The State of Maharashtra,(1961) 3 SCR 440 মামলায় আদালতের রায়ে প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আজীবন কারাদণ্ড এবং এর চেয়ে কম কিছুই নয় এবং যেহেতু, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একটি অনির্ধারিত মেয়াদের কারাদণ্ড, সেহেতু এটি কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড নয়। ৬..... ধারা ৪২৮ এর অধীন একমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে: এই ব্যক্তিকে কি একটি মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে? সুবিধার জন্য, প্রশ্নটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, এই ব্যক্তিকে কি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে? এবং, দ্বিতীয়ত, তাকে কি একটি মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে? এক্ষেত্রে সম্ভবত কোনও বিরোধ থাকতে পারে না যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে কারাদণ্ডই দেওয়া হয়েছে। তাহলে তার সাজার মেয়াদ কী? এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর হলো যে মেয়াদে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে তা আজীবন কারাবাস। সুতরাং, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে একটি মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।"

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট Bhagirath (supra) মামলায় এই অভিমত দেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে কোন অভিযুক্ত ব্যাক্তির ভোগকৃত কারাবাস দণ্ডের মেয়াদ থেকে বাদ (সেট অফ) যাবে যদি কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৪৩২ বা ধারা ৪৩৩ অনুসারে কোনও আদেশ জারী করে। এই জাতীয় আদেশ ব্যাতিত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হচ্ছে বাকি জীবনের জন্য কারাবাস।

২০০৫ সালে, Bhagirath মামলার (পূর্বোল্লিখিত) সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক পরে, আইনসভা একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৩ সালের কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারায় একটি শতাংশ যুক্ত করেছিল যা স্পষ্ট করে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরাও ৪২৮ ধারার সুবিধা পাবেন। ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারার ভাষা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির। Ranjit Singh Vs. State of Panjab (2010)12 SCC 506 মামলায় Bhagirath (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছিল এবং ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৪২৮ এ উল্লিখিত সেট-অফের সুবিধা যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তকে দেওয়া হয়েছিল। পর্যালোচনাধীন রায়টি Kartar Singh and others (পূর্বোল্লিখিত) মামলার উপর নির্ভর করে প্রদান করা হয়েছিল, যদিও উক্ত মামলাটির সিদ্ধান্ত Bhagirath (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় বাতিল করা হয়েছিল।

ভারতে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪৩৩এ ধারা প্রবর্তনের কারণ হল কখনও কখনও ক্ষমা মঞ্জুর করার কারণে হত্যাকারীরা পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাস পাওয়ার কারণে ৫ থেকে ৬ বছর শেষে মুক্তি পেয়ে যায়। এটিকে রোধ করার জন্য আইনসভা ১৯৭৮ সালের ৪৫ নং আইন

অনুসারে ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে ৪৩৩এ ধারা অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বলা হয় যে, আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ড অন্যতম শাস্তি এমন কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে বা যেখানে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার পর ৪৩৩ ধারার অধীনে সেটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত হয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি ৪২৮ ধারা অনুসারে সেট-অফসহ ১৪ বছর কারাভোগ করেন। পূর্বোক্ত ধারা দ্বারা, ভারতীয় আইনসভা একজন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে ক্ষমা প্রদর্শন ও সাজা হ্রাসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারের ক্ষমতা উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত কারাবাস ১৪ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের মূল ৩৫ক ধারা এবং ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারা বিবেচনা করে আমরা দেখতে পেলাম যে, মূল ৩৫ক ধারা ১৯৯১ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল, তবে তা ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশে পরবর্তীকালে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের আইন নং ১৯) ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। প্রতিস্থাপিত ৩৫ক ধারাটি নীচে উল্লেখ করা হল:

> "অপরাধীরা হেফাজতে থাকতে পারে এমন মামলায় কারাদণ্ডের ছাড়-(১) কেবল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের মামলা ব্যাতীত, যখন কোনও আদালত কোনও অপরাধের জন্য কোনও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে এই জাতীয় অভিযুক্তকে যে কোনও মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে, তখন এই অপরাধের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আসামিরা ইতোমধ্যে যে সময় হেফাজতে থাকতে ছিল তা কারাদণ্ডের মোট সাজা থেকে বাদ যাবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে যদি মোট হেফাজতের সময়কাল অভিযুক্তকে দণ্ডিত হওয়ার সময়কালের চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে অভিযুক্তকে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়ে গিয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং অন্য কোন অপরাধের সাথে জড়িত না থাকলে বা প্রয়োজন না হলে তাকে একবারে মুক্তি দেওয়া হবে; এবং যদি অভিযুক্তকেও এই জাতীয় সাজা ছাড়াও কোনও জরিমানা প্রদানের সাজা দেওয়া হয়, তবে জরিমানা হবে।"

মূল ৩৫ক ধারা এবং প্রতিস্থাপিত ৩৫ক ধারার তুলনায় আমরা দেখতে পাই যে, আইনসভা পুরোপুরি ভালভাবে জেনেও উপরোক্ত অসংশোধিত বিধানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ৩৫ক ধারার অধীনে আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সুবিধা দেয়নি। আইনসভা মূল ধারাটি মাথায় রেখে ৩৫ক ধারা প্রতিস্থাপন করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, কেবল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ৩৫ক ধারার সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই প্রতিস্থাপিত ৩৫ক ধারা এছাড়াও আদালতকে এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকার সময় মোট মেয়াদে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা থেকে এই সাজা বাদ দেওয়ার অনুমতি দেয়। ৩৫ক ধারাতে 'ব্যাতীত' এবং 'কেবল' শব্দটি ব্যবহার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামিদেরও ৩৫ক ধারার সুবিধা দেওয়ার ইচ্ছা আইনসভার ছিল।

পর্যালোচনাধীন রায়ে বলা হয়েছে যে, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে ২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং-১৫-১৬ এর শুনানিতে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের মূল ৩৫ক ধারা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি, যেখান থেকে পর্যালোচনার জন্য এই ফৌজদারি আবেদনের উদ্ভব হয়েছে। পর্যালোচনার অধীনে থাকা রায়টি প্রকাশ করে যে, কোনও দোষী ব্যক্তি তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে হেফাজতে থাকা সময় বাদ দেওয়াকে অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে না এবং এটি আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা এবং এটি সেই অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল)। পর্যালোচনার অধীনে রায়ের আর একটি বক্তব্য হল যদিও 'কেবল' শব্দটি ৩৫ক ধারাতে ব্যবহার করা হয়েছে, আইনসভায় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারা এবং পেনাল কোডের ৫৩ ধারা বিবেচনা না করেই 'কেবল' শব্দটি ঢোকানো হয়েছে, তবে 'কেবল' শব্দের ব্যবহার কোনও পার্থক্য করবে না যেহেতু প্রচলিত আইনের পরিকল্পনার অধীনে কোনও ক্ষমা/দণ্ড মওকুফের বিষয়টি কেবল সরকারের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার প্রতিস্থাপিত ধারাটি পড়তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতাকে একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলার কোনও সুযোগ নেই। সংশোধিত ৩৫ক ধারাতে ব্যবহৃত ভাষাটি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন এবং আদালত সরল ভাষায় প্রকাশিত আইনসভার উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং তাই আসামি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে প্রকৃত আটকের সময়কাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে হ্রাস করতে হবে।

এটি আইন ব্যাখ্যার একটি মূল নিয়ম যে, কোনও বিধি বিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত কোনও শব্দ বা বিধানকে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, আদালত সর্বদা ধরে নেয় যে আইনসভা তার প্রতিটি অংশ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সন্নিবেশ করেছিল এবং আইনসভার উদ্দেশ্য হল এই যে, সংবিধানের প্রতিটি অংশ কার্যকর হবে। এটি বলা ঠিক হবে না যে, কোনও সংবিধিতে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমষ্টি অপ্রয়োজনীয় বা কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই রাখা হয়েছে, যদি না সংবিধির পরিকল্পনার দিকে নজর দিয়ে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবেচনা করার বাধ্যতামূলক কারণ না থাকে (Sankar Ram & Co. Vs. Kasi Nicker and others (2003)11 SCC 699)।

"Ut res magis va leat quam pereat" এই ম্যাক্সিমটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কোন কিছু বাতিল হওয়ার থেকে তা কার্যকর হওয়া ভালো। ম্যাক্সওয়েলের মতে, আদালতের কাজ আইনসভার উদ্দেশ্য একটি আইনকে ব্যাখ্যা করা এবং এটি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এর কাজটি ইউস ডিসেরে (*jus dicere*), ইউস ডারে (*jus dare*) নয়: কোনও বিধির কোন শব্দ অবশ্যই বিচারকগণের বাতিল করা উচিত নয়, আইনের সংস্কার অবশ্যই সংসদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে (Maxwell- Interpretation of Statutes, 12 th edition, page-1-2)। এটি আইন ব্যাখ্যার একটি মূল নিয়ম যে, কোনও বিধি বিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত কোনও শব্দ বা বিধানকে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Shafiqur Rahman Vs. Idris Ali, (1985) 37 DLR (AD)71 মামলায় ধারণা করা হয়েছে যে, আইন ব্যাখ্যার একটি মূল নীতি হল, এটি অবশ্যই ধরে নেওয়া উচিত যে আইনসভা কোনও শব্দ প্রয়োজন ছাড়া বা

কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যবহার করে না।

Shamsuddin Ahmad, Advocate Vs. Registrar, High Court of East Pakistan (1967) 19 DLR (SC) 483 এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কোনও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত নিয়ম হলো কোনও আইনের কোনও শব্দই অপ্রয়োজনীয় বা উদ্বৃত্ত নয়। আইনের বিধানাবলি সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে পড়ে প্রতিটি শব্দের অর্থ প্রদান করতে হবে। উপরোক্ত মামলার নীতিগত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলা যায় না যে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৪০১ এবং পেনাল কোডের ৫৩ ধারা বিবেচনা না করে 'কেবল' শব্দটি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের পরিবর্তিত ৩৫ক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সাজা প্রদানের আগে যে সময়কাল হেফাজতে ছিল তা তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে বাদ পাওয়ার অধিকারী।

ভারতে *Pandit Kishori Lal Vs. The King-Emperor (1944) 26 ILR (Lahore) Privy Council 325* মামলা হতে আজ অবধি ধারাবাহিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ পুরো বাকি জীবন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিরোধ দেখা দেয় যখন নির্বাহী বিভাগ ভারতীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের বিভিন্ন ধারার অধীনে রিমিশন (ছাড়) প্রদান করে এবং আদালত যখন এই ক্ষমতা প্রয়োগ বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ জাতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে নির্বাহী বিভাগকে বারিত করে।

ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, ভারত বিভাজনের তারিখ থেকে এই রিভিউ রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিক প্রচলন ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যা পরবর্তী সংশোধনীর মাধ্যমে পেনাল কোডের সংশোধিত ৫৭ক ধারায় ৩০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে এটি সত্য যে, পেনাল কোডের ৫৭ ধারা হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য শাস্তির বিধানের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য- যা ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য হবে। পেনাল কোডের ৫৭ ধারা কারাদণ্ডের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য প্রণীত হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সময়কাল সর্বদা ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয় (৫৭ ধারা সংশোধনের আগে ছিল ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড)। আমরা এই আদালতে কিংবদন্তী বিচারকদের পেয়ে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলাম, যারা পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অধীনে সাজা দেওয়ার সময় আইনে না থাকা "দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের শেষ অবধি" শব্দগুলো ব্যবহার না করে বিধিবদ্ধ শব্দ "মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" ব্যবহার করতেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ কী হবে তা নির্বাহী বিভাগের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে এবং নির্বাহী বিভাগ ছাড় দিতে পারে বা নাও পারে। তবে দণ্ডিত ব্যক্তির সাজার রায় প্রদানের আগে তার কারাবাসের সময়কাল প্রদানকৃত মোট শাস্তি হতে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার অধীনে আদালতের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

রেয়াতের মাধ্যমে সাজার মেয়াদ কমানোর জন্য প্রিজনস অ্যাক্ট, ১৮৯৪ (১৮৯৪ এর ৯ নং আইন) এর ৫৯ ধারার (৫) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে জেল কোডের ২১ অধ্যায়ে বিধিমালা করা হয়েছে। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারার অধীনে মুক্তির জন্য কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গণনাকৃত যে কোনও রেয়াত (রিমিশন) সরকারকে প্রেরণ করতে হবে। তবে জেল কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত এ জাতীয় রেয়াত কোনও বৈধ

কারণ নির্ধারণ না করেই সরকার প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, কারণ রেয়াত (রিমিশন) সংক্রান্তে জেল কোডের ২১ অধ্যায়ের বিধিগুলো প্রিজনস অ্যাক্ট, ১৮৯৪ এর ৫৯(এফ) ধারার অধীনেই তৈরি করা হয়েছে। পেনাল কোডের ৪৫ এবং ৫৩ ধারার মিলবিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমাদের পেনাল কোডের ৫৫ এবং ৫৭ ধারা এই দুটি ধারাকে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার সাথে একত্রে পড়তে হবে এবং আমরা এই মতামত দিচ্ছি যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল গণনা করা উচিত।

আইনের ব্যাখ্যাটি একেবারেই আদালতের কাজের মধ্যে রয়েছে এবং এই প্রশ্নটি অনেক আগে প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল ১৮০৫ সালে *Marbury Vs. Madison (5 U.S. 137)* মামলায় নিষ্পত্তি করেছেন। এই ক্ষেত্রে মার্শালের বিখ্যাত কথা হলো, 'জোর দিয়ে বলা যায় যে বিচার বিভাগ বলে দিবে কোনটি আইন।' সেই বিখ্যাত কথাগুলো মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের দেওয়ালে খোদাই করা আছে।

পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এবং জেল কোডের অধীনে শাস্তি কমানো ও ছাড় দেওয়ার বিষয়টি নির্বাহী সরকারের এখতিয়ারভুক্ত এবং এ জাতীয় সুবিধা সরকার কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রদান করা যেতে পারে। তবে আদালত নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই আদেশ প্রদানের এখতিয়ার রাখে যে, আসামি শাস্তি কমানো, বাদ এবং রেয়াতের (রিমিশন) জন্য পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এবং জেল কোডের সুবিধা পাবেন না এবং আদালতের এই কর্তৃত্বের বিস্তারিত বর্ণনা আমার ভাই বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী তার রায়ে লিখেছেন।

উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে আমার মত হলো, এই রায়টি পর্যালোচনা করা উচিত এবং আইনসভা কর্তৃক প্রশ্নটি একেবারে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা করে দেওয়া উচিত।

প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী:-

হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ বজায় রেখে এবং সাজা কমিয়ে জীবনের বাকি সময়ের কারাদণ্ড দিয়ে ২০১০ সালের ১৫ নম্বর ফৌজদারী আপিলে এই বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে এই ফৌজদারি রিভিউ আবেদনটি করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তভাবে মামলার ঘটনা হলো, ২০০৩ সালের ৩৪ নং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলায় গত ১৫.১০.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল পেনাল কোডের ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে আবেদনকারী আতাউর মৃধা @আতাউর এবং আরও দু' জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি অনুমোদনের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স পাঠানো হয়, যা ২০০৩ সালের ১২৭ নং ডেথ রেফারেন্স হিসেবে নিবন্ধিত হয়। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারী হাইকোর্ট বিভাগে ২০০৩ সালের ৩৮৯৫ নং ফৌজদারী আপিল এবং ২০০৩ সালের ৭৩৯ নং জেল আপিল

দায়ের করেন। জেল আপিলের সাথে ডেথ রেফারেন্স এবং আপিলের শুনানি করার পর হাইকোর্ট বিভাগ ৩০.১০. ২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে রেফারেন্স গ্রহণ করেন, আপিল খারিজ করেন এবং সে অনুসারে দোষী সাব্যস্ততা বহাল রেখে আবেদনকারী এবং অপর দুই পলাতক আসামির মৃত্যুদণ্ডের সাজা অনুমোদন করেন। আপীল বিভাগে আবেদনকারী ২০০৮ সালের ১১৬ নং ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল এবং সহ-দণ্ডিত মোঃ আনোয়ার হোসেন ২০০৮ সালের ১৩৬ নং ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল আপিল দায়ের করেন, যা শুনানির পর লিভ মঞ্জুর হয় এবং মামলাগুলো যথাক্রমে ২০১০ সালের ১৫ এবং ১৬ ফৌজদারি আপিল হিসাবে নিবন্ধিত হয়। ১৪.০২.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে এই বিভাগ উভয় আপিল খারিজ করেন এবং দোষী সাব্যস্ততা বহাল রাখেন, তবে আপিলকারীদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কমিয়ে জীবনের বাকি সময়ের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

১৫ নং ফৌজদারি আপিল মামলার আপিলকারী এই আদালতের রায় ও আদেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য এই দরখাস্ত আনয়ন করেন। আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে, ১৩. ০৪. ২০১৩ তারিখে একই বিভাগের সমপর্যায়ের বেঞ্চের পূর্বে ঘোষিত রায়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে এই বিভাগ (আপীল বিভাগ) আপাতদৃষ্টিতে ভুল করেছে। *19 BLC (AD) 204*-এ প্রকাশিত মামলাটি একই আইনগত বিষয় সম্পর্কিত ছিল এবং এর ফলে আপীল বিভাগের তর্কিত রায়টি 'পার ইনকুরিয়াম ('*per incuriam*)' হিসাবে পরিগণিত হয়ে বিচারিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে এবং সেজন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাজতবাসের মেয়াদ গণনা সম্পর্কিত দেশের আইনের সঙ্গে অসঙ্গতি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এই বিভাগ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ, পেনাল কোড ১৮৬০ এর ৫৭ ধারা, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮ এর ৩৫ক ধারা, প্রিজনস অ্যাক্ট ১৮৯৪ এর ৫৯ ধারা, জেল কোডের ২১ অধ্যায় (রিমিশন) এর বিধান এবং একই বিভাগের সম-সমমানের বেঞ্চের পূর্বে উচ্চারিত রায়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়ে নথি দৃষ্টেই ভুল করেছে এবং সেজন্য আইনের বিধানের সুনির্দিষ্টতা এবং সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য তর্কিত রায়টি এই আদালত পুনর্বিবেচনা করতে আইনত বাধ্য। এই বিভাগ জেল কোডের ২১ অধ্যায়ের যেই ৭৫১ বিধি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়ে নথি দৃষ্টেই ভুল করেছে সেই বিধিতে বলা আছে যে 'যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির অর্থ এমন একজন বন্দী যার শাস্তি ৩০ বছরের কারাদণ্ডের পরিমাণ' এবং এই ৫৯ বিধিটি কারা আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সালের ৯ নং আইন) এর অধীনে প্রণীত হওয়ায় সেটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত আইনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং সেজন্য "জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে কোনও নির্ধারিত মেয়াদের এই রূপান্তর স্পষ্টতই এখতিয়ারবহির্ভূত" মর্মে আদালতের পর্যবেক্ষণ আইনত সঠিক নয় এবং এটি বাতিলযোগ্য। এই বিভাগ যথাযথ কারণ উল্লেখ না করেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতের হাজতবাস গণনাসংক্রান্ত কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার বিধানের প্রযোজ্যতা নাকচ করে দিয়ে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন ২০০৩ –এ আইনসভার ইচ্ছাকে বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করেছে এবং জোর করে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতি লঙ্ঘন করে ত্রুটিযুক্ত রায় হয়েছে বিধায় এটি আইনত সঠিক নয় এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাতিলযোগ্য।

আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, এই আদালতে দণ্ডিতদের আপিল শুনানির সময় মামলার ঘটনা এবং পেনাল কোডের ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিচারকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আপিলের একমাত্র

প্রার্থনা হলো, মৃত্যুদণ্ডের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করা। তর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে আপিলকারীদের সাজা মৃত্যুদণ্ড হতে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা হয়েছে, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছিল আপিলকারীদের বাকি জীবনের কারাদণ্ড। আর সেটিই এখন এই রিভিউ মামলায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

একটি বিস্তৃত দৃষ্টিকোণে, এই রিভিউ মামলায় আমাদের সেই বিষয়টির সিদ্ধান্ত দিতে হবে যেখানে গুরুতর এবং অতি জঘন্য অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, তবে প্রাথমিকভাবে বিচার্য বিষয়টি হলো সেই সময়ের দৈর্ঘ্য যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভোগ করতে হবে।

সাজা দেওয়া কোনও বিচারকের পক্ষে কখনই সহজ কাজ নয়, কারণ এটি নাগরিকের জীবন/স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত, যিনি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেও সংবিধান এবং আইন দ্বারা তার সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষিত। সাজা প্রদানের নির্দেশিকার অনুপস্থিতিতে সাজা প্রদানের সিদ্ধান্তটি বিষয়গত হতে বাধ্য এবং বিচারিক/আপিল আদালতের বিচারকের মনে সৃষ্ট ঘৃণার উপলব্ধি ও মাত্রা দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য। কিছু ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট ধরণের অপরাধের জন্য বিরক্ত হওয়াটা মানব প্রকৃতির বিষয়, যদিও অন্যের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট ধরণের অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে আলাদা ধারণা থাকতে পারে। একইভাবে প্রাপ্তবয়স্কের বিপরীতে একটি শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ কারো কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হতে পারে। সুতরাং, সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এবং খোশখেয়াল কাজ করবে, যতক্ষণ না সাজা প্রদানসংক্রান্ত নির্দেশিকায় উদ্দেশ্যগত মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা যায়। অবশ্যই, এটি অস্বীকার করা যায় না যে এই জাতীয় উদ্দেশ্য এবং কখনও কখনও গাণিতিক নির্দেশিকা মানবিক উপাদানকে কেড়ে নিবে, যা প্রায়শই বিচারকেরা সুবিবেচনার মাধ্যমে প্রয়োগ করতেন। তবে নির্দেশিকা না দেওয়া হলে সাজা প্রদানের প্রক্রিয়াতে অভিন্নতা অর্জন করা যাবে না। অধিকন্তু আমাদের ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়াতে পৃথক শাস্তি-শুনানির জন্য কোনও তারিখ নির্ধারণ করা হয় না; সেজন্য আসামির পক্ষে সাজা হ্রাসকারী কোনও তথ্য বা অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করে এমন অবস্থানসমূহ তুলে ধরার সুযোগ নেই যা তার সাজা হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।

এই রিভিউ মামলার বিচার্য বিষয়গুলো আমার বিজ্ঞ ভ্রাতা বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বিশদভাবে এবং যত্নশীলতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সেজন্য সেগুলো পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সামনে বিচার্য বিষয় হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ; এটি কারাবন্দির শেষ নিঃশ্বাসের অবধি কারাবাস নাকি বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখের পরে এবং কারাবন্দির মারা যাওয়ার আগে কোনও সময় শেষ হওয়ার একটি মেয়াদের কারাবাস। এই মামলায় উদ্ভূত অন্য মূল বিষয়টি হলো, যাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তার সাজা থেকে বিচারের সময় কারাগারে ব্যয়িত সময়কাল ছাড় পাওয়ার অধিকারী কিনা। এই ক্ষেত্রে এটি বলা যায় যে, আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে পারিনি এবং আমার নিজের মতামত ব্যক্ত করে পৃথক রায় না লিখে পারছি না।

তর্কিত রায়ে এই আদালত পেনাল কোডের ৫৭ ধারাসহ ৪৫ ধারার অধীনে 'জীবন'-এর সংজ্ঞাটি বিবেচনায় নিয়েছে। সিদ্ধান্তের সারকথা হলো, যেখানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের শাস্তি হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত হয়, সেখানে অপরাধের অশ্লীলতা ও জঘন্য প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময় কারাবাস করতে হবে মর্মে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আরও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল যে,

অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন হেফাজতের সময়কাল কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার সহায়তায় কর্তন করা অনুমোদনযোগ্য হবে না। অন্যান্য মামলাসহ ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের *Swami Shraddananda vs. The State of Karnataka and another, (2016) SCC 1* মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, "মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা প্রযোজ্য নয়। কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি অধিকার হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে হাজতবাসের সময়কাল কর্তনের দাবি করতে পারবেন না। এটি আদালতের বিচক্ষণ ক্ষমতা।" প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার রায় মতে।

কোনও দোষী ব্যক্তির কারাদণ্ডের চূড়ান্ত সাজা থেকে হাজতবাসের সময়কাল কর্তনের বিধান মূল্যায়ন করার জন্য এটি বিবেচনা করা দরকার যে, কোনও অপরাধীকে কারাগারে বন্দী রাখা হয় এটা নিশ্চিত করতে যে তিনি আর কোনও অপরাধ করতে না পারেন, সমাজ যেন তার অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং তিনি তার ভুল উপলব্ধি করেন এবং আর কোনও অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। কারারোধের পরিষ্কার ফলাফল হলো, দোষী ব্যক্তি তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং তিনি প্রাতিষ্ঠানিক হেফাজতে অর্থাৎ কারাগারে বন্দি।

এটি বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, যদি দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে তিনি কারাগারে পাঁচ বছর ভোগেন, তবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে পাঁচ বছর কারাদণ্ডের চূড়ান্ত আদেশ থেকে বাদ দেওয়া হবে, কারণ বিচার চলাকালে ইতোমধ্যে কারাগারের অভ্যন্তরে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (দ্বিতীয় সংশোধন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৯১ দ্বারা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা প্রবর্তন করে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে হাজতে ব্যয়িত সময়কাল ছাড়ের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে দণ্ডিত ব্যক্তি তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে হাজতের সময়কাল বাদ দেওয়ার বিধান রয়েছে। সেই সময় এই বিধানটি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দণ্ডপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। ২০০৩ সালে ৩৫ক ধারাটি সংশোধন করা হয়, যার ফলস্বরূপ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগের হাজতকাল বাদ দেওয়ার বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়। সুতরাং, ২০০৩ সালের সংশোধনীর উদ্দেশ্য অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তার সাজা থেকে সাজা-পূর্ব কারাবাসের সময়কাল কর্তনের সুবিধা দেওয়া হয়। সুতরাং, কোনও দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হলে আদালতের দায়িত্ব হবে প্রদত্ত সাজা হতে হাজতবাসের সময়কাল বাদ দেওয়া। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই বিধানটি বাধ্যতামূলক। ২০০৩ সালে সংশোধনের আগে (৩৫ক) ধারাটি ছিল নিম্নরূপঃ

> "৩৫ক। দণ্ডিত ব্যক্তি হাজতে থাকলে কারাদণ্ডের মেয়াদ- দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সময় কোনও ব্যক্তি হাজতে থাকলে এবং যেই অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সেই অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় না হলে, আদালত কারাদণ্ডের সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অব্যবহিত আগের তার হাজতবাসের ধারাবাহিক সময়কাল বিবেচনায় নিতে পারে।

> তবে শর্ত থাকে যে, যেই অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের মেয়াদ আইনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সাজা সেই সময়ের চেয়ে কম হবে না।'' [কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (দ্বিতীয় সংশোধন) অর্ডিন্যান্স ১৯৯১ এর ২ ধারা]

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ২০০৩ এর ২ ধারাবলে এই বিধানটি সংশোধন করা হয়েছে, যা বর্তমানে কার্যকর রয়েছে এবং বিধানটি নিম্নরূপ:

> "৩৫ক। দণ্ডিত ব্যক্তি হাজতে থাকলে তাদের কারাদণ্ডের ছাড়-
>
> (১) কেবল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ ব্যাতীত, যখন আদালত কোনও অপরাধের জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্তের মাধ্যমে দণ্ডিত করে এই ধরনের অভিযুক্তকে যে কোনও মেয়াদের সাধারণ বা কঠোর কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে এই অপরাধে ইতোমধ্যে অভিযুক্ত হাজতবাস করে থাকলে আদালত তার হাজতবাসের মোট সময়কাল কারাবাসের সাজা থেকে বাদ দিবে।"

পূর্ববর্তী আইনের 'মে (may)' শব্দটি পরিবর্তন করে 'শ্যাল (shall)' করা হয়েছে। সুতরাং এই বিধানটি যে এখন বাধ্যতামূলক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই এবং রায় ঘোষণার আগে দণ্ডিত ব্যক্তির হাজতবাসের সময়কাল তার সাজা হতে বাদ দেওয়ার দায়িত্ব আদালতের উপর।

আদালত কোনও নাগরিকের আইনে প্রদত্ত সুবিধা হরণ করতে পারবে না। যখন গণতান্ত্রিক আইনসভা কর্তৃক কোনও আইন প্রণয়ন করে, তখন প্রতিটি নাগরিক এটি মেনে চলতে বাধ্য। একইভাবে, আইন-আদালত কোনও বিধি-বিধানকে সংবিধানের নিয়মবিরুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে বাতিল করা ব্যতিরেকে বাধ্যতামূলক বিধানকে উপেক্ষা করতে পারে না।

তদনুসারে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ যে কোনও মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাজা প্রদানকারী আদালত ওই ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখের আগে এই অপরাধে হাজতবাসের মোট সময়কাল বাদ দিবে, যেমনটা বলা হয়েছে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারায়।

যাই হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে কোনও দোষী ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের বিধান কার্যকর করতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দেয়, কারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সংখ্যায় ব্যক্ত করা যায় না; এটি একটি অনির্দিষ্ট মেয়াদ। আইনসভা সহজেই কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার সহায়তায় এমন বিধান যুক্ত করতে পারত যে ছাড়ের উদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩০ বছরের (বা আইনসভা কর্তৃক উপযুক্ত বলে বিবেচিত অন্য কোনও সংখ্যা) সমতুল্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এই সমস্যাটি একটি ছোট আইনী সংশোধনীর মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। তবে সেই সময় পর্যন্ত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সময়কাল কী তা গণনা করার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য পেনাল কোডের ৫৭ ধারায় প্রদত্ত মানদণ্ড কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিকল্প হিসাবে, জেল কোডের অধীনে প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধার বরাতে সুবিধা প্রদান করা যায়, যার ৭৫১ বিধিতে বলা হয়েছে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বলতে ১ম ও ২য় শ্রেণীর বন্দিদের ক্ষেত্রে ২৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ৩য় শ্রেণীর বন্দির ক্ষেত্রে ২০ বছরের কারাদণ্ড।

একইভাবে পেনাল কোডের ৫৭ ধারার বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ছাড়ের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, যেমনটা *Bashir and 3 Others Vs. The State, PLD 1991 (Supreme Court) 1145* মামলায় পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট অভিমত দিয়েছে এবং বিচারপতি রুস্তম এস সিদ্ধ তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, 'পেনাল কোডের ৫৭ ধারার অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২৫ বছরের কারাদণ্ড বলে বিবেচিত হয়, তবে এটি মূলত সাজা মওকুফ ব্যবস্থার সীমিত উদ্দেশ্যে।' আইনে ফাঁকের দণ্ডিতকে সুবিধা অস্বীকার করার পরিবর্তে অবশ্যই সুবিধা প্রদানের জন্য 'উবি জাস, ইবি রেমিডিয়াম' অর্থাৎ যেখানে অধিকার আছে সেখানে প্রতিকার রয়েছে- এই নীতি আদালতের অনুসরণ করা উচিত। নিঃসন্দেহে, প্রতিকার লাভের অধিকার সকল আইনি ব্যবস্থায় একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমান মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাসহ চূড়ান্ত সাজা থেকে বিচারাধীন সময়ে হাজতবাসের সময়কাল বিয়োজনের অধিকার আইনে অন্তর্ভুক্ত একটি অধিকার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা থেকে ছাড়ের গণনা করার মানদন্ডের অনুপস্থিতির কারণে সেই সুবিধা কেড়ে নেওয়া যায় না, যেই সুবিধা সংশোধিত আইনে অনুমোদনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য যুক্ত হয়েছে।

এটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, যেক্ষেত্রে মওকুফ, হ্রাস, ক্ষমা ইত্যাদি সুবিধাগুলো মর্জিমাফিক, সেক্ষেত্রে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারার অধীনে ছাড়ের সুবিধা হলো বাধ্যতামূলক। জেল কোড এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের অধীনে ছাড়ের (রিমিশন) সুবিধাপ্রদান আদালতের কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে না, যেখানে ৩৫ক ধারার অধীনে উল্লিখিত ছাড় (রিমিশন) আদালতের উপর ধার্যকৃত একটি দায়িত্ব।

সাজার প্রশ্নে আমাকে প্রথম এবং সর্বাগ্রে বলতে হবে যে, সুপ্রীম কোর্ট দেশের আইনের উপরে বা তার বাইরে নয় এবং আইন দ্বারা অনুমোদিত সাজা প্রদান করতে বাধ্য। সুতরাং যখন পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অধীনে সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ঠিক যেমন ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারে না, তেমনি এটি 'বাকি জীবনের কারাদণ্ডের' সাজাও দিতে পারে না। উল্লিখিত দুটি শাস্তির কোনটিও পেনাল কোডের দ্বারা অনুমোদিত নয়। ৩০২ ধারায় বলা হয়েছে যে, "যেই ব্যক্তিই খুন করে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং জরিমানার জন্যও দায়বদ্ধ করা হবে।" পেনাল কোডের সংশোধন ছাড়া পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অধীনে কোনও অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ততার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য কোনও আদালত নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের কারাদণ্ড কিংবা স্বাভাবিক জীবনের কারাদণ্ড অথবা এরকম কোনও মেয়াদের সাজা দিতে পারে না। একইভাবে, মৃত্যুদণ্ডের সাজা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কোনও আদালত আইনে বর্ণিত সাজা ব্যাতীত অন্য কোনও সাজা দিতে পারে না, যা ৩০২ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' হতে হবে।

অধিকন্তু, প্রথম দফায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আইনে কোনও বিধান নেই। উভয় ক্ষেত্রেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের একই অর্থ হবে। মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে হ্রাস করার অর্থ এই যে, অপরাধের শাস্তিযোগ্যতা বা জঘন্যতা বিচারিক আদালতের চেয়ে আপিল আদালতের কাছে কম বলে বিবেচিত হয়েছে। এটার অর্থ এই নয় যে, খুন সংঘটনে দুই দণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার জঘন্যতা অবলম্বন করেছে বিধায় আইনের অধীনে কারাবন্দির এই ধরনের

মুক্তির মর্জিমাফিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় তারা আলাদাভাবে বিবেচিত হবে না। নির্বাহী বা বিচারিক- যেই কর্তৃপক্ষই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে ভাবেন, তাকে অবশ্যই কারাবন্দি কর্তৃক সমাজের পুনরায় ক্ষতি হওয়ার প্রবণতার বিষয়টি ভাবতে হবে।

পেনাল কোডের ৪৫ ধারার কথা হলো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সহজাত অর্থ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়ের কারাদণ্ড। আমার বিনীত অভিমত হলো, এই ধারাটির অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হলে ভুল হবে। সুতরাং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 'দণ্ডিতের প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়'-এর জন্য বলাটা প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে। *Rokia BegumVs. State, 13 ADC (2016) 311* মামলার রায়ে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল যে, "বাংলাদেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ সাড়ে বাইশ বছর মর্মে যেই ধারণা রয়েছে তা পুরোপুরি একটি ভুল ধারণা; যা প্রকৃতপক্ষে একটি ভুল ব্যাখ্যা। পেনাল কোডের 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' শব্দগুলোর ব্যাখ্যার অর্থ 'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবন'। তবে এটা বলা যায় না যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে কোনও ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অবশ্যই কারাবাসেই তার দিন শেষ করবে। আপিলে শাস্তি বাতিল না হলে সাজা একই থাকবে, তারপরেও আইন দ্বারা প্রদত্ত সুবিধার কারণে কারাবন্দি ব্যক্তির মুক্তি হতে পারে। যেমনটা আমি পরে আলোচনা করব যে, অন্যান্য বিধিবিধান ও আইনের চাহিদা অনুসারে যেসব বিধান প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং সংবিধান বা অন্য আইনের বিধান যেখানে দণ্ডিতকে তার মৃত্যুর আগে জেল থেকে মুক্তি দিতে দেয়, সেক্ষেত্রে ওই আইনের অন্য কোনও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ হলে ওই বিধানটি সমানভাবে বাস্তবায়নযোগ্য। এই দিকটি নীচে আলোচনা করা হবে।

এই সন্ধিক্ষণে বোঝার সুবিধার্থে একই ধরনের আইনি বিধান প্রযোজ্য থাকা ভারত ও পাকিস্তানে কীভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিষয়টির অর্থ বোঝানো হয়, সেদিকে যে কেউ নজর দিতে পারেন। বাংলাদেশের পেনাল কোডের উৎপত্তি ভারত ও পাকিস্তানের মতো। তবে অনেক বছরে পাকিস্তানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি স্থির হয়েছে বলে মনে হয়। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ দোষী ব্যক্তির জীবনের শেষ অবধি কারাদণ্ড মর্মে কিছু মামলায় সিদ্ধান্ত দিলেও শেষে বলছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ ২৫ বছরের কারাদণ্ড। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পাকিস্তান পেনাল কোডের ৫৭ ধারা এবং প্রিজনস অ্যাক্টের অধীনে প্রণীত পাকিস্তান কারা বিধিমালা ১৯৭৮ এর ১৪০ বিধির বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বলা আছে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ ২৫ বছর। সম্মানের সাথেই বলছি, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পেনাল কোডের ৫৭ ধারায় উল্লিখিত কথার সুবিচার করে না, যেখানে বলা হয়েছেঃ "৫৭। শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশ। শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য গণ্য করা হবে"। [পেনাল কোডের ৫৭ ধারায় সংশ্লিষ্ট কারাবাসের সময়কাল ভারতের ক্ষেত্রে ২০ বছর এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৩০ বছর।]

আমার বিনীত মতে, উপরে বর্ণিত ধারাটি বলে না যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২৫ বছরের সমতুল্য, বা আমাদের এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় যে, কারাদণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা/গণনা করার উদ্দেশ্যে সমতুল্যতা বোঝানো হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, কম সাজা প্রদানের সুবিধা কোনও অপরাধের সহায়তাকারী প্রদান করা, যে অপরাধটি সংঘটিতই হয়নি [পেনাল কোডের ১১৬ধারা]। একইভাবে, জেল কোডের অধীনে থাকা ক্ষমতার সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অপরাধের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২৫ বা ২০ বছর

হিসাবে গণ্য করতে হবে। সুতরাং, "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড"-এর সময়কালের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বছর ধরে পরিমাপ করা একটি আইনী কল্প যা সুবিধা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং, এটি স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২০ বা ২৫ বা ৩০ বছর নয়, তবে কোনও দোষীকে দেওয়া কোনও সুবিধা গণনা করার জন্য, এটি বছরের একটি সসীম মেয়াদের সমতুল্য হিসাবে গণনা করা যেতে পারে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের শেষ অবধি। বাংলাদেশ, আমার বিনীত মতে, এখন একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক উদ্ধৃত সিদ্ধান্তটি হল, *Vinayak Godse v. The State of Maharastra and others, AIR 1961 SC 600* মামলায়, যেখানে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি কে.সুবা রাও -এর মতে

> "ভারতীয় পেনাল কোডের ৫৭ ধারার কোন সংযোগ নেই আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়ে।শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য এই ধারায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিশ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য গণ্য হবে। এটি বলে না যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সকল উদ্দেশ্যে বিশ বছরের জন্য দ্বীপান্তর বলে গণ্য হবে; বা সংশোধিত ধারায় "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" শব্দটির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দের প্রতিস্থাপন হওয়াও এই জাতীয় কোনও গ্রহণযোগ্য কল্প সৃষ্টি করে না। দ্বীপান্তর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি বলতে প্রাথমকিভাবে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনের বাকি সময়কালের জন্য দ্বীপান্তরিত বা কারাবন্দী থাকাকে বোঝানো হয়।"

R. v. Foy, 1962 All ER 246 মামলাটিতে ইংলিশ কোর্ট অফ আপিল একই মতামত ব্যক্ত করেছিল, যা নিম্নেবর্ণিত হলো:

> "যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ হলো আজীবনের জন্য কারাবাস। সন্দেহ নেই যে, অনেক ব্যক্তিই জীবিত থাকা অবস্থায় কারাগার হতে বের হয়ে আসে, তবে যখন তারা বেরিয়ে আসে তখন তারা কেবল অনুমতিপত্র সাপেক্ষেই বের হয়, এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তিটি তাদের উপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহাল থাকে।"

সুতরাং, স্পষ্টতই এটা স্বীকৃত যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও মৃত্যুর আগেই কারাগার ছেড়ে বের হয়ে যেতে পারে। তবে এটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে মৃত্যুদণ্ডের সাজা যেমন সমস্ত আশার অবসান ঘটায়, সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তিও ঠিক একই প্রভাব সৃষ্টি করবে, কেননা এরূপ শাস্তি দণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের বাকি সময়কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটিকে প্যারোলবিহীন জীবন হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং ইংল্যান্ডের আদালতগুলিরও "পুরো জীবনের জন্য আদেশ" প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে, যার অর্থ হলো দণ্ডিত ব্যক্তি তার বাকি জীবন কারাগারেই বন্দী থাকবে। এক্ষেত্রে, বন্দীর একমাত্র সান্ত্বনা এই যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারাগারের প্রাচীরের মধ্যেই সে বেঁচে থাকবে এবং শ্বাস নেবে। এটি মৃত্যুর চেয়েও খারাপ একটি পরিণতি, কেননা বন্দী প্রতি মুহূর্তে এটা মনে করেই বেঁচে থাকবে যে সে আর কখনওই তার পরিবারের কাছে এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তার জীবনের সেরা অংশটি কেটেছে সেখানে ফিরে যেতে পারবে না। রোকেয়া বেগম মামলাটিতেও একই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ মামলাটিতে ইয়োর্কশায়ার মুরস হত্যা মামলার উল্লেখ আছে, যেখানে উভয়

আসামিকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন কারাগারেই মারা গিয়েছিল এবং অপর দণ্ডিত ব্যক্তিকে পাগল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সে বার বার নিজের মৃত্যু কামনা করছিল। এই মামলাটিতে পরিষ্কারভাবে এটাই ব্যক্ত হয় যে, কোনও অপরাধীর জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার অর্থ হলো আজীবনের জন্য কারাবাস, মৃত্যু এর চেয়ে একটি কম শাস্তিমূলক বিকল্প হত। হিন্ডলি, যাকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হওয়ার ঠিক পরে ১৯৬৬ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, একটি চিঠিতে লিখেছিল যে, "আমি জানতাম আমি স্বার্থপর কিন্তু ফাঁসি হয়ে যাবার চিন্তাটা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। যদিও, পরবর্তীতে বছরের পর বছর আমি এটাই ভেবেছিলাম যে, ফাঁসি হয়ে গেলেই ভালো হতো"। (২৯.০২.২০০০ তারিখে বিবিসি নিউজে রিপোর্টকৃত)।

মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া হলে তা বন্দীকে এই আশা দেয় যে, একদিন, খুব শীঘ্রই সে আবার তার পরিবারের সাথে একত্র হবে।

মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কমিয়ে বন্দীকে যদি বলা হয় যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে তার বাকি জীবন কারাবন্দী থাকবে, এটা তার জীবনের সমস্ত মঙ্গল কেড়ে নিবে; এটা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির চেয়েও খারাপ। এটা তার কাছ থেকে এই আশা কেড়ে নেয় যে সে আবারও পরিবার-পরিজন বেষ্টিত হয়ে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাধারণ জীবন যাপন করতে পারবে। প্রতিদিন সে এটা মনে করেই বেঁচে থাকবে যে কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী থাকা অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে এবং দাফনের জন্য শুধুমাত্র তার মৃতদেহটিই পরিবারের কাছে ফেরত যাবে।

সংবিধান, পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এবং জেল কোড দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন, বিরাম মঞ্জুর, হ্রাসকরণ, রূপান্তর, স্থগিতকরণ এবং মওকুফ অনুমোদন করে। এরূপ ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলে তা হবে সংবিধান/আইনের পরিপন্থী, যা কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল করতে পারে না। সংবিধান মোতাবেক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যাস্ত।

আদালতের কর্তব্য হচ্ছে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আদালতের আইন প্রণয়নের এখতিয়ার নেই। হাইকোর্ট বিভাগের সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে সংবিধানের পরিপন্থী ঘোষণা করার এখতিয়ার রয়েছে, কিন্তু আইন প্রণয়নের বা কীভাবে কোনও আইন প্রণয়ন বা প্রণীত করা যায় সে বিষয়ে কোনো পরামর্শ প্রদানের এখতিয়ার নেই।

সংবিধানের ৪৯ ধারার অধীনে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন, বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে কোনও দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার। এটা পেনাল কোড এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরেও নিশ্চিত করা হয়েছে। দণ্ডবধির ৫৫এ ধারাতে বলা আছে যে, সরকারের দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন, বিরাম মঞ্জুর বা হ্রাসকরণের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করবে না। রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের ক্ষমতা হলো সাংবিধানিক বা আইনগত ক্ষমতা, যা ইচ্ছামত কেড়ে নেয়া যাবে না। সুপ্রীম কোর্টের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের এখতিয়ার নেই এবং শুধুমাত্র কোনো আইন বা আইনের ধারাকে সংবিধানের পরিপন্থী ঘোষণা করার এখতিয়ার আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ পরিপন্থী ঘোষণা করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আইনের ধারাগুলো সকলের উপর বাধ্যতামূলক থাকবে।

সুতরাং, সংবিধান, পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, জেল কোড এবং প্রিজনস অ্যাক্ট ১৮৯৪ এর ৫৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে প্রণীত বিধি এবং অন্য কোনও আইনে অভিযুক্ত বা অপরাধীকে কোনও সুবিধা প্রদান করলেও, তা মূলত আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তবে পরিস্থিতি যেখানে দাবি করে সেখানে বিবেচনামূলক ক্ষমতা বা বিচক্ষণতা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করতে হবে। জেল কোডের বিধানের অধীন কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও দণ্ডের হ্রাস গণনা করা হলে তা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারার অধীন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হবে, যা বন্দীর মুক্তির জন্য বিবেচিত হবে। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারায় প্রদত্ত দণ্ড স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে কী না, তা সরকারের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করবে। সরকার কোনো আবেদন মঞ্জুর করা হবে, না কি প্রত্যাখ্যান করা হবে, এ বিষয়ে যে বিচারক দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশটি প্রদান করেছেন বা যিনি আপিলে দন্ডাদেশটি মঞ্জুর করেছেন, তার মতামত চাইতে পারে। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারায় বলা আছে যে, যদি কোনও শর্ত যার ভিত্তিতে কোনো সাজা স্থগিত বা মওকুফ করা হয়েছে তা পূরণ না করা হয়, তাহলে সরকার স্থগিতাদেশ বা ক্ষমা বাতিল করতে পারে, এক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিকে অনুত্তীর্ণ সাজা ভোগ করতে হবে। এটা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে যে, বিচারিক আদালত কর্তৃক আসামীকে প্রদত্ত শাস্তিটি যেমন ছিল তেমনই থাকবে এবং শুধুমাত্র দন্ডাদেশটি স্থগিত বা পরিবর্তিত হবে। তবে এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা বা সরকারের সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা কোনওভাবেই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং, যে ব্যক্তি কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাকে প্রদত্ত দন্ডাদেশ এবং শাস্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ থাকবে, যতক্ষণ না এটি কোনও আপিল বা রিভিশনাল আদালত কর্তৃক বাতিল করা না হয়। অতএব, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন আসামীকে মুক্তি প্রদান করলেও তা আদালতের দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশটিকে মুছে ফেলে না, এটা প্রদত্ত শাস্তিটিকে বিলুপ্ত করে না। একইভাবে, কোনও দন্ডাদেশ স্থগিত, হ্রাস বা মওকুফ করা হলেও তা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজায় আদেশটিকে বাতিল বা অকার্যকর করে না। রাষ্ট্রপতি/সরকারের পদক্ষেপ কেবল দোষীকে কারাবাস থেকে মুক্তি দেওয়ার অনুমতি দেয়। দোষী সাব্যস্তকরণ ও প্রদত্ত সাজা রেকর্ডভুক্ত থাকে।

অপরদিকে, এমন একজন আসামীকে কী মুক্তি প্রদান করা উচিত হবে যে অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির একটি অপরাধ সংঘটন করেছে এবং যার জন্য বিচারক তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন যে সমাজকে রক্ষার জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কারাগার হতে মুক্তি পাওয়া উচিত নয়? এমন কী এরূপ অবস্থাতেও এমন পরিস্থিতি তৈরী হতে পারে যখন মানবতা তার মুক্তির জন্য আহ্বান জানাবে। সেক্ষেত্রে, বিচার বিভাগকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা এবং বন্দীকে কখনওই মুক্তি প্রদান করা হবে না- এরূপ কোনো আদেশ জারি করতে বাধ্য করাটা সমীচীন হবে না। এটা মানবিকতার খাতিরে আদালতের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করার যে অধিকার তা হরণ করার সমান হবে। যখন এরূপ কোনো পরিস্থিতি, যা অপরাধটির মাত্রা লঘু করে, আদালতের নজরে আনা হয়, তখন মূল আদেশটি আসামীকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী রাখা সংক্রান্ত হলেও, সমাজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিবেচনা করে আদালত কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো শর্ত সাপেক্ষে আসামীকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটা আসামীকে কিছুটা আশা দেয় যে সে কারাগারে বন্দী অবস্থাতে মারা নাও যেতে পারে। মুদ্রার অপর দিকটি হলো যে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রপতি বা সরকার যে কোনো সময় সংবিধান/প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে আসামীকে মুক্তি প্রদানের যে ক্ষমতা তা প্রয়োগ

করতে পারে। আসামীকে এটা বলার কোনো মানেই হয় না যে, মৃত্যুদণ্ডের সাজা হ্রাস করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত তাকে কারাগার ছাড়ার অনুমতি দেয়া হবে না, কেননা এক্ষেত্রে আসামীকে মূলত কারাগারেই মৃত্যু বরণ করার শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

আপিল বা রিভিশনে পরিবর্তিত না হলে, আসামীকে প্রদত্ত দন্ডাদেশটি কখনওই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। তাকে মৃত্যুর আগে মুক্তি প্রদান করার মানে এই নয় যে, প্রদত্ত শাস্তিটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে কম। প্রদত্ত সাজাটি রয়ে যায়, কিন্তু আসামী আইনের বিধানগুলির সুবিধা পায় যা তার কারাবাসের সময়সীমা হ্রাস বা প্রাথমিক মুক্তির অনুমতি দেয়। তবে, যে কোনো শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তার মুক্তি বাতিল করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে সাজাটি পুনর্বিবেচনা/পুনরুজ্জীবিত করা হয়, যার ফলে অনুত্তীর্ণ সাজা ভোগের জন্য আসামী কারাগারে ফিরে আসে।

পেনাল কোডের ৫৪ ধারায় বলা আছে যে, "মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে এরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধকারীর সম্মতি ছাড়াই সেই দণ্ডকে অত্র বিধি বলে ব্যবস্থিত অন্য যেকোন স্বল্প দণ্ডে রূপান্তরিত করতে পারবেন।" একই বিধির ৫৫ ধারায় বলা আছে, যে সকল ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, সে সকল ক্ষেত্রে সরকার অপরাধীর সম্মতি ব্যতিরেকেই দন্ডাজ্ঞা হ্রাস করে অনূর্ধ্ব ২০ বছর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে পরিবর্তন করতে পারবেন। পেনাল কোডের ৫৫ক ধারায় বলা আছে যে, ৫৪ বা ৫৫ ধারার কোন বিধান দ্বারাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন, মৃত্যুদণ্ড মওকুফ বা স্থগিত করা বা দন্ডাজ্ঞা হ্রাসের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০২ এ ধারায় বলা আছে যে, ৪০১ এবং ৪০২ ধারা বলে সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন পুনর্বিবেচনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত আমাদের নজরে এনেছিলেন যেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় প্রদান করা হয়েছিল এবং সুস্পষ্টভাবে এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে কারাদণ্ডের মেয়াদ ২০ বছর, ২৫ বছর বা ৩০ বছরের কম হবে না। অন্যদিকে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডকে বোঝানো হবে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, যুক্তরাজ্যের আদালতগুলি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে প্যারোল আবেদনের যোগ্য হওয়ার আগে অপরাধীকে ন্যূনতম কতটুকু সময়কাল কারাগারে কাটাতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন ছুরি বা অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে কোনো হত্যাকান্ড সংঘটন করা হয়, তখন ২৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার আগে বন্দীকে প্যারোলে মুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। ব্যতিক্রমিভাবে এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে অপরাধী তার বাকি জীবন কারাগারে ব্যয় করবে। এটাকে "সার্বিক জীবনের জন্য আদেশ" হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এটা সবচেয়ে গুরুতর ঘটনায়, যেমন, ক্রমিক হত্যাকারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানটি হলো, বেশির ভাগ রাজ্যে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বন্দীকে প্যারোলে মুক্তির জন্য বিবেচনা করা হয়। তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যে, যেহেতু বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন শাস্ত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ৩০ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেহেতু আইন পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত এরূপ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত।

দেখা যাচ্ছে যে, পর্যালোচনার আবেদনকারীদের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তি পেনাল কোডের ৫৭ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা হতে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, "শাস্তির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ত্রিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য গণনা করা হবে। জনাব খন্দকারের মতে, এই বিধানের ব্যাখ্যাটি সর্বদা কার্যকর ছিল যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা বলতে ৩০ বছর মেয়াদী কারাদণ্ডকে বোঝানো হবে। এছাড়াও, কয়েদী পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, প্রিজনস অ্যাক্ট এবং জেল কোডের মতো আইনের বিবিধ বিধানের অধীনে ক্ষমা এবং অন্যান্য ছাড় প্রাপ্ত হবার অধিকারী ছিল। তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যে পেনাল কোডের ৪৫ ধারার বিধানটি পেনাল কোডের ৫৩, ৫৪ এবং ৫৫ ধারার বিধানের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে, যা স্পষ্টভাবে এটাই ইঙ্গিত দেয় যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে কয়েদীকে বাকি জীবন কারাগারেই থাকতে হবে, এমনটির প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য আমি জনাব খন্দকার সাহেবের সাথে একমত হব যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ এই নয় যে বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ড, তবে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে বাধ্য হই যে পেনাল কোডের ৫৭ ধারার বিধানের অর্থ এটা নয় যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য।

আমি এর সাথে যোগ করতে পারি যে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের অধীনে কোনো অপরাধীর জন্য দণ্ড মওকুফ বা হ্রাসের যে বিধান রাখা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩ এর অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত আসামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ উক্ত আইনের ২৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনের অধীনে গৃহীত যে কোনো কার্যক্রমে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ এর বিধানগুলির প্রয়োগ বিশেষভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে ১৯৭৩ সালের আইনের ২৩ নং ধারাটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> "২৩. কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭৮ (১৮৭২ সালের ১নং আইন) এর বিধানগুলি এই আইনের অধীনে গৃহীত কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

পরিশেষে, সাজা প্রদানের নীতিমালার আরও একটি দিক রয়েছে যে সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখতে পাই যে, ইংল্যান্ডসহ অনেক দেশেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি আরোপের পর বিচারক বিশেষভাবে আদেশ দিতে পারেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হবে না, যা দশ বছর থেকে শুরু ষাট বছর পর্যন্ত যেকোনো সময়কাল হতে পারে, এমনকি বাকি জীবনের জন্যও হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাজা প্রদানের নির্দেশিকা অনুসরণ করেন। অতীতে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আপিল আদালতে বসে রায়ের মাধ্যমে সাজা প্রদানের নির্দেশিকা জারি করেছিলেন। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে সাজার নির্দেশিকা পরিষদ এবং সাজার উপদেষ্টা পরিষদ বাতিল করে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের জন্য সাজা পরিষদ গঠিত হয়।

২০০৮ সাল থেকে *Swamy Shraddananda v. State of Karnataka (2008) 13 SCC 767* মামলার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদানের সময় এটা উল্লেখ করার নীতি গ্রহণ করেছে যে, আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হবে না। শ্রাদ্দানন্দ

মামলায় এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, যেখানে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি যথোপযুক্ত হবে না এবং আদালত এটা দৃঢ়ভাবে মনে করে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যা সাধারণত চৌদ্দ বছরের মেয়াদে কার্যকর হয়, তা চূড়ান্তভাবে অনুপযুক্ত এবং অপর্যাপ্ত হবে, সেক্ষেত্রে আদালত মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরোপ করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, আরও ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত এবং যথাযথ কার্যক্রম হবে বিকল্পগুলিকে প্রসারিত করা এবং ১৪ বছরের কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির একটি মধ্যবর্তী শাস্তি নির্ণয়, যা আইনত আদালতের ক্ষমতার অন্তর্গত, তা আদালতকেই প্রদান করা। মাননীয় বিচারপতিগণ আরও বলেন যে, "আমরা স্পষ্টতই মতামত ব্যক্ত করেছি যে, আদালতের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছরের অধিক মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদানের ভালো এবং শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে এবং এটাও নির্দেশ করার কর্তৃত্ব রয়েছে যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অথবা আদেশে যেরূপ মেয়াদ উল্লেখ করা আছে তা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হবে না। পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলোতেও এটা অনুসরণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা গরিষ্ঠ রায়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সুতরাং, আমি সেগুলির পুনরাবৃত্তি করা হতে বিরত থাকব। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সাজা প্রদানের পদ্ধতির সাথে ইংলিশ আদালতের সাজা প্রদানের পদ্ধতির মিল রয়েছে এবং আদালতকে একজন জঘণ্য অপরাধী যাতে সমাজে ফিরে সমাজের ক্ষতি করতে না পারে তা নিশ্চিত করার যে বিচক্ষণতা প্রদান করা হয়েছে, সেটাও অত্যন্ত যথোপযুক্ত। কিন্তু, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে অনুসৃত পদ্ধতিটি মূলত সরকারী অনুমোদিত নির্দেশিকাগুলোর উপর ভিত্তি করে করা, যেখানে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলো একই আদালতের পূর্ববর্তী রায়ের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয় এবং এগুলো অপরাধের ভয়াবহতা বা নৃশংসতা সম্পর্কে পৃথক বিচারকের ধারণার উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক মতামতের জন্য উন্মুক্ত।

বাংলাদেশে সাজা প্রদানের নির্দেশিকা জারি করার কোনও নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেই এবং ফলস্বরুপ, বিচারকগণ পেনাল কোড এবং অন্যান্য বিশেষ আইনগুলোতে শাস্তিসমূহ বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর দ্বারাই পরিচালিত হন এবং কিছু ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি তুলনামূলক নমনীয় শাস্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার আওতায় বন্দীদের হেফাজত হতে সাড়ে বাইশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে মুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। এই পটভূমিতে বিচারকগণ তারা যে অপরাধটি সবচেয়ে জঘন্য বলে মনে করেন সেটির জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বেছে নেন, যেহেতু কার্যকরভাবে এটিই সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তি।

কিছু পথ নির্দেশক নীতি এই বিভাগের রায়সমূহ হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে, তবে সেগুলো কেবল কিছু নির্দিষ্ট মামলার সাথেই সম্পর্কিত। এমন কোনও সাধারণ নির্দেশিকা নেই যা বিচারিক আদালতের বিচারকগণ অনুসরণ করতে পারেন। যদি আমাদের আইনে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উন্নয়নের নির্দেশিকাতে বা দোষীকে তার জীবদ্দশায় বা নির্দিষ্ট সংখ্যক বছর অতিবাহিত না হলে মুক্তি প্রদান করা হবে না, এমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য কোনও বিধান থাকত, তাহলে সম্ভবত বিচারকগণ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির পরিবর্তে দীর্ঘতর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি বেছে নিত। এরূপ শাস্তিও "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" হবে, তবে এক্ষেত্রে বিচারকগণ ন্যূনতম কতবছর দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারাগারে থাকতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন, যার মাধ্যমে অপরাধের জঘন্যতার মাত্রার প্রতিফলন ঘটবে।

উপরন্তু, যেমনটি আমরা উপরে ব্যাখ্যা করেছি, বিচার প্রক্রিয়াটি রায় ঘোষণার পর শাস্তি প্রশমনের আবেদন প্রদানের কোনোরূপ অনুমতি দেয় না। ফলস্বরূপ, বেশির ভাগ সময় সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা

পরিলক্ষিত হয় এবং অভিযুক্তপক্ষের সাজা কমানোর আবেদন করার অথবা বিচারকগণের প্রশমনমূলক পরিস্থিতি বিবেচনা করার কোনো সুযোগ থাকে না। পূর্বে আমাদের আইনে সাজা শুনানির জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত থাকতো, এরূপ পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন আসামীকে প্রশমনমূলক পরিস্থিতিগুলো আদালতের সামনে তুলে ধরার সুযোগ প্রদান করবে।

সাজা শুনানির বিধানের সাথে সাথে বিচারকগণের পূর্ব মুক্তির ক্ষেত্রে কারাবন্দীকে ন্যূনতম কত সময়কাল আদালতে থাকতে হবে তা নির্ধারণ করে দেয়ার ক্ষমতা থাকলে, প্রদত্ত সাজাটি অধিক ন্যায়পরায়ণ এবং যুক্তিসঙ্গত হবে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি প্রদান করতে চাই:

১) পেনাল কোডের ৪৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এমন কোনো ব্যক্তিকে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" প্রদানের অর্থ হলো দণ্ডিত ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য কারাদণ্ড অর্থ্যাৎ কোনও আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদি বাতিল বা পরিবর্তিত না হয়, তবে এরূপ শাস্তি দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এটি বিচার, আপিল পুনর্বিবেচনা বা পর্যালোচনা শেষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত প্রত্যেক ব্যক্তি এবং যাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে তাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে, অন্য যে কোনও আইনের অধীনে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে পূর্ব মুক্তির আদেশ দেয়া যেতে পারে।

২) পেনাল কোডের ৫৭ ধারায় উল্লিখিত "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" বলতে ৩০ বছরের সমতুল্য কারাদণ্ডকে বোঝানো হবে, যা পেনাল কোডে বর্ণিত শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে এরূপ ভগ্নাংশ গণনার কথা উল্লেখ আছে।

৩) সাজা মওকুফ বা হ্রাস করা হবে কীনা তা আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে এবং এটিকে অধিকার হিসেবে দাবি করা যাবে না এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ও জেল কোড অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে এরূপ হ্রাস বা মওকুফ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে যেকোনো সময় মুক্তির জন্য বিবেচিত হতে পারে, যদি জেল কোড অনুযায়ী ভালো আচরণ অথবা সেবা প্রদানের জন্য জেল কর্তৃপক্ষ তার সাজার মেয়াদ কমিয়ে দেয়। তবে, এ বিষয়গুলি আদালতের কার্যকারিতার বাইরে।

৪) সংবিধান, পেনাল কোড এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের অধীনে রাষ্ট্রপতির সাজা মওকুফ, স্থগিতকরণ, রহিতকরণ এবং হ্রাস করার অধিকার কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হবে না।

৫) পূর্ব মুক্তি উক্ত কার্যবিধির ৪০১(২) হতে ৪(এ) ধারায় উল্লিখিত সাজা আদালত কর্তৃক আরোপিত যেকোনো যুক্তিসঙ্গত শর্ত সাপেক্ষে হতে পারে। ছাড়ের মাধ্যমে বা অন্যথায় সাজা হ্রাস করা হলেও, দণ্ডিত ব্যক্তিকে এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা বহাল থাকবে এবং যে শর্তসমূহ সাপেক্ষে তাকে পূর্ব মুক্তি প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করলে অবশিষ্ট সাজা ভোগের জন্য তাকে পুনরায় আদালতে প্রেরণ করা হবে।

৬) মৃত্যুদণ্ডের সাজা হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের মধ্যে এবং বিচারিক, আপিল বা সংশোধনী আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় প্রদানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তবে যখন তাড়াতাড়ি মুক্তির কথা বিবেচনা করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অপরাধের জঘন্যতা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এটি করা উপযুক্ত কীনা তা বিবেচনা করবে।

৭) দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখের আগে যে সময়টুকু হেফাজতে ব্যয় করে, সাজা ঘোষণার সময় আদালত সে সময়টুকু কেটে রাখবে। হেফাজতে ব্যয়কৃত সামগ্রিক সময়কাল কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে, বিধির ৩৫ক ধারার সহায়তায় যথাযথ সংশোধন না করা পর্যন্ত বিচারচলাকালীন সময়ে হেফাজতে থাকার সময়কাল কেটে নেয়া হবে এই ভিত্তিতে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনাধীন রায়টিতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে এবং উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে পর্যালোচনার আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

এই ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশনটি ২০১০ সালের ১৫ নং ফৌজদারি আপিলে এই আদালত কর্তৃক ১৪.০২.২০১৭ তারিখে যে রায় এবং আদেশ প্রদান করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে রিভিউ আবেদনকারীর দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশটি বহাল রাখা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আজীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল।

এর আগে, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর ১৫.১২.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারী আতাউর মৃধা এবং আনোয়ার হোসেনকে পেনাল কোডের ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ২০০৩ সালের ১১১ নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলায় তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা ১৬.১২.২০০১ তারিখে পিডব্লিউ-২ আফতাবউদ্দিন, পিডব্লিউ-৪ আব্দুল বারেক এবং পিডব্লিউ-৫ মো: ইয়ামিনের সাথে গল্পরত থাকা অবস্থায় জামাল নামক ব্যক্তিকে চারবাগ মাদরাসা সংলগ্ন রাস্তার পাশে হত্যা করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ হত্যার শিকার ব্যক্তিকে গুলি করেন, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। আপিলকারীরা হাইকোর্ট বিভাগে ২০০৩ সালের ৩৮৯৫ নং ফৌজদারি আপিল দায়ের করেন এবং ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলার নথি প্রেরণ করেন, যা ২০০৩ সালের ১২৭ নং ডেথ রেফারেন্স হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত ফৌজদারি আপিল এবং ডেথ রেফারেন্সের একত্রে শুনানি করেন এবং ডেথ রেফারেন্সটি অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ২৯.১০.২০০৭ এবং ৩০.১০.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি আপিলটি খারিজ করেন। এর বিপরীতে, আবেদনকারী এই আদালতে ২০১০ সালের ১৫ নং ফৌজদারি আপিল দায়ের করেন,

যেখানে এই আদালত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশটি বহাল রাখেন, তবে ১৪.০২.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের সাজা হ্রাস করে আসামীকে আজীবনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আবেদনকারী বর্তমান রিভিউ করার জন্য এই রিভিউ পিটিশনটি দায়ের করেছেন।

রিভিউ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন মামলার গুণাগুণের প্রশ্নে না গিয়ে সাধারণভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পেনাল কোডের ধারা ৫৭, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক, প্রিজনস অ্যাক্ট ১৮৯৪ এর ধারা ৫৯ এবং জেল কোডের অধ্যায় XXI-এর অধীনে আবেদনকারী সাজা হ্রাস এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবেদনকারীকে সাজা প্রদানের আদেশ তাকে আইনী সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত করবে, যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। তিনি দাবি করেন যে, একজন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী দুই পর্যায়ে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, সেগুলো হলো: (১) সাজা কর্তন এবং (২) ক্ষমা, তবে পর্যালোচনার অধীন রায়টি এই সুবিধাগুলিকে নিরর্থক করে তোলে। তিনি আরও দাবি করেন যে, পেনাল কোডের ৫৫ ধারা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ এবং ৪০২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা স্থগিত/হ্রাস করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। জনাব হোসেনের মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ গণনা করার ক্ষেত্রে এটিকে ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা উচিত, অন্যথায়, পেনাল কোডের ৫৭ ধারার ব্যাখ্যা দৃশ্যত বৈষম্যমূলক হবে এবং আইনসভার উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হবে এবং এটি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৯৭ ধারার একটি অংশকে নিরর্থক করে তুলবে। তিনি সর্বশেষে যোগ করেন যে, একটি যুক্তিযুক্ত এবং বিস্তৃত সাজা প্রদানের নির্দেশিকা এই ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে তিনি একটি সাজা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। জনাব হোসেন তার বক্তব্যে *Union of India and others Vs. Dharam Paul; Sachin Kumar Singhraha Vs. State of Madhya Pradesh reported in AIR 2019(SC) 1416; Dnyaneshwar Suresh Borkar Vs. State of Maharastra reported in AIR 2019 SC 1567; Nanda Kishore Vs. State of Madhya Pradesh reported in 2019(1) SCALE 500; Viral Gyanlal Rajput Vs State of Maharastra reported in (2019) 2 SCC 311; Babasaheb Maruti Kamble Vs. State Maharastra reported in 2018(15) SCALE 235. Tattu Lodhi Vs. State of Madhya Pradesh reported in (2016) 9 SCC 675; Amar Singh Yadab Vs. Estate of UP reported in (2014) 13 SCC 443; Sahib Hossain Vs. State of Rajstan reported in (2013) 9SCC 778; Gurvail Singh* এবং *others Vs. State of Punjab reported in (2013) 2 SCC 713* এবং অন্যান্য আরও কিছু মামলার উপর নির্ভর করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম উপস্থাপন করেন যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ হলো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ড। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অবশিষ্ট জীবনব্যাপী কারাদণ্ড ব্যাতীত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আর কোনও ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। তিনি আরও উপস্থাপন করেন যে, পেনাল কোডের ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে কেবল দুই ধরনের শাস্তির বিধানের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো, মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আদালত কোনও তৃতীয় ধরনের শাস্তি প্রবর্তন করতে পারে না যা আইনের বিধানের পরিপন্থী। জনাব আলম নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর নির্ভর করেছিলেন:-

Kishori Lal Vs. Emperor reported in AIR 1945 (PC)64; Gopal Vinayek Godse Vs State of Maharastra reported in (1961) 3 SCR 440; State of Madhya Prodesh Vs. Ratan Singh and others reported in (1976) 3 SCC 470; Dalbir Singh and others Vs. State of Punjab reported in (1979) 3 SCC 745; Kartar Singh and others Vs. State of Hariyana reported in (1982) 3SCC 1; Ashok Kumar @ Gulu Vs. Union of India reported in (1991) 3SCC 498; Maru Ram VS. Union of India reported in (1981) 1 SCC 107; Subash Chander Vs. Krishan Lal and others reported in (2001) 4 SCC 458; Mohammad Munna Vs. Union of India and others reported in (2005) 7 SCC 417; Swamy Shraddananda @ Murali Monohar Misra (2) Vs. State of Karnataka reported in (2008) 13 SCC 767; Sangeet and another Vs. State of Haryana reported in (2013) 2 SCC 452; Union of India Vs. V. Sriharan @ Marugan and others reported (2016) 7SCC এবং *Vikas Yadav Vs. State of Uttar Pradesh (2016) 9 SCC 541*

এ বিষয়ে শুনানি চলাকালীন বিজ্ঞ আদালত জনাব রোকনউদ্দিন মাহমুদ, জনাব এ এফ হাসান আরিফ এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক খান, সিনিয়র কাউন্সেলকে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে আদালতে উপস্থিত হয়ে আদালতকে সহযোগিতার অনুরোধ করেন। তাঁরা আদালতে উপস্থিত থেকে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

জনাব রোকনউদ্দিন মাহমুদ উপস্থাপন করেন যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ হলো দণ্ডিত ব্যক্তি কারাগারে প্রবেশ করবে এবং অনুভূমিকভাবে কারাগার হতে বের হয়ে আসবে, অর্থাৎ তিনি তার বাকি জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবেন। জনাব আরিফ, সিনিয়র কাউন্সেল, উপস্থাপন করেন যে, পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় "জীবন" শব্দটিকে অত্যন্ত নমনীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা ধারাটির দ্বিতীয় অংশ হতে পরিলক্ষিত হয়, যেখানে বলা আছে "যদি না প্রসঙ্গ হতে অন্যরূপ প্রতীয়মান হয়"। তিনি বলেন, এটি সত্য যে পেনাল কোডের ৫৭ ধারাটি একটি বিবেচ্য বিধান এবং মূল বিধান নয় যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ৩০ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে, তবে এটি উল্লেখযোগ্য যে আইনসভা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ৩০ বছরের সমতুল্য কারাদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছে।

তিনি উপস্থাপন করেন যে, পেনাল কোডের ৪৫ এবং ৫৭ ধারা যদি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক এবং ৩৯৭ ধারার সাথে পাঠ করা হয়, তাহলে এরূপ যুক্তির পক্ষে একটি শক্ত ভিত্তি আছে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে ৩০ বছরের সমতুল্য কারাদণ্ডকে বোঝায়। জনাব আব্দুর রাজ্জাক খান, সিনিয়র কাউন্সেল, বলেন যে, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানিক বিধান এবং সংশোধিত কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৯৭৩, বিশেষত এর ৪২৮, ৪৩২, ৪৩৩ এবং ৪৩৩এ ধারাগুলো বিবেচনা করেছিল, যা আমাদের কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে অনুপস্থিত এবং আমাদের আইনে এরূপ বিধিবদ্ধ বিধানের অনুপস্থিতিতে কোনোরূপ ছাড় ব্যাতীত বাকি জীবনের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় সিদ্ধান্তের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। এ মামলায় বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের মূল বিষয়টি হলো কোনও আসামির বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ কী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ড, নাকি তার চেয়ে কম সময়কালের জন্য কারাদণ্ড।

মানবাধিকার আইনের অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বীকৃত এবং বিশ্বের অনেক দেশ গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসেবে এটিকে ব্যবহার করে। বিচার বিভাগে শাস্তি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিতর্কিত রয়ে গেছে। কতিপয় আইনবিজ্ঞানী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে মৃত্যুদণ্ডের সমতুল্য মনে করেন, কারণ এটি নিজেই একটি মৃত্যুদণ্ড গঠন করে। এটি বিশ্বব্যাপী জঘন্য অপরাধের জন্য সর্বাধিক আরোপিত শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে প্রতিস্থাপন করেছে। ফলস্বরূপ, এটি আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থায় শীর্ষস্থানীয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড বিভিন্ন রকম হতে পারে। এর সবচেয়ে গুরুতর রূপ হলো প্যারোল ছাড়াই বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ড, যেখানে ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রদান করা হয়; আবার এটি কোনো সুনির্দিষ্ট সময় কাল নির্ধারণ না করেও প্রদান করা হতে পারে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয় না যে দোষীকে কতদিন কারাগারে ব্যয় করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আইনের ক্রমবর্ধমান বিকাশ এমন অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যা এখনও উত্তরবিহীন রয়ে গেছে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি রয়ে গেছে। অনির্দিষ্ট শাস্তি আরোপের মূল কারণ হচ্ছে সমাজকে রক্ষা করা। সাধারণ প্রতিরোধের লক্ষ্য হলো যে সমস্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে তাদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সম্ভাব্য অপরাধীদের এই বার্তা প্রেরণ করা যে অপরাধ সম্পাদন করলে তাদেরও এরূপ শাস্তি পেতে হবে। এভাবে অপরাধীকে ততক্ষণ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী রাখা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা নির্ধারিত হয় যে অপরাধী সমাজের জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনবে না। সাধারণত যৌবনেই গুরুতর অপরাধমূলক আচরণ সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শব্দটি বিভিন্ন বাস্তবতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোকে বিবেচনা করলে দণ্ডিত ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা ন্যায্য হবে কী না। সম্প্রতি Katie Reade "Life imprisonment: A practice in desperate need of reform" নামক প্রবন্ধে প্যারোল ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে এমন একজন আসামীর বক্তব্য তুলে ধরেন: "কারাগারের জীবন অত্যন্ত ধীর ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর সমতুল্য। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি না দিয়ে আমাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিলেই মনে হয় ভালো হতো, তাহলে আমাকে জেলে বসে পচতে হতো না। এটি কোনো উদ্দেশ্যই হাসিল করে না। এটি প্রত্যেকের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।" "এটি গভীর সমুদ্রে ডুব দেয়ার মতো। সমস্ত রকম গভীরতায় নিমজ্জিত হয়ে অক্সিজেন নষ্ট করার মতো।"

যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ধারণাটি মূলত এটাই ব্যক্ত করে যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কয়েদীকে কারাগারে বন্দী থাকতে হবে, এক্ষেত্রে মৃত্যুই কেবল তাকে মুক্তি প্রদান করবে। কিছু বিচার ব্যবস্থায় আক্ষরিকভাবেই এর অর্থ হলো, কোনোরূপ প্যারোলের সম্ভাবনা ছাড়াই দণ্ডিত ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কাল কারাগারে বন্দী থাকবে। অন্যান্য বিচার ব্যবস্থায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এই ভিত্তিতে যে কিছু নির্দিষ্ট বছর কারাগারে অতিবাহিত করার পর বন্দী প্যারোলে মুক্তির জন্য বিবেচিত হবে। "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দটিকে পেনাল কোডে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। সাধারণভাবে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একটি শাস্তি, যা রাষ্ট্রকে কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার ক্ষমতা প্রদান করে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি কার্যকর করার প্রকৃত পদ্ধতি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের

ইতিহাস এবং এটি কার্যকর করার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনাকারী প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ বিধানসমূহের বিষয়ে সঠিক আইনী অবস্থান কী তা জানতে হলে সর্বোচ্চ আদালতের মতামতের সাথে পেনাল কোড, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, প্রিজনস অ্যাক্ট এবং একই ধরনের আইনের বিধানসমূহ গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করতে হবে। উত্থাপিত বিষয়টির বিবেচনার জন্য আইনের কিছু বিধান পুনরায় উল্লেখ করা জরুরি, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ কী কোনোরূপ ছাড়সহ অথবা ছাড় ছাড়াই আজীবনের জন্য কারাদণ্ড কী না। আইনের বিধানসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো: পেনাল কোডের ধারাসমূহ-

৪৫. "জীবন"- প্রসঙ্গ হতে অন্যরূপ প্রতীয়মান না হলে "জীবন" শব্দটি দ্বারা মানুষের জীবন বোঝাবে।

৪৬. "মৃত্যু"- প্রসঙ্গ হতে অন্যরূপ প্রতীয়মান না হলে "মৃত্যু" শব্দটি দ্বারা মানুষের মৃত্যু বোঝাবে।

৫৩. "দণ্ড"- এই বিধির বিধানসমূহের আলোকে অপরাধীরা যেসকল দণ্ডে দণ্ডিত হবে, সেগুলো হলো:

প্রথমত,- মৃত্যুদণ্ড;

দ্বিতীয়ত,- [যাবজ্জীবন কারাদণ্ড];

তৃতীয়ত,- [ফৌজদারি আইন (বৈষম্যমূলক অধিকার নির্মূল) আইন ১৯৪৯ (১৯৫০ সালের ২ নং আইন) দ্বারা বাতিলকৃত];

চতুর্থত,- কারাদণ্ড, যা দুই প্রকারের হতে পারে, যথা:

(১) সশ্রম, অর্থাৎ কঠোর শ্রমসহ; এবং

(২) বিনাশ্রম;

পঞ্চমত,- সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি;

ষষ্ঠত,- অর্থদণ্ড।

[ব্যাখ্যা- যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে কারাদণ্ড অবশ্যই সশ্রম হবে]

৫৩এ. দ্বীপান্তর উল্লেখের ব্যাখ্যা: (১) ২ উপধারার শর্তাবলী সাপেক্ষে সাময়িকভাবে প্রচলিত অন্য যেকোনো আইনে যেখানে যাবজ্জীবন "দ্বীপান্তর"-এর উল্লেখ আছে, সেখানে সেটিকে "যাবজ্জীবন কারাবাস" ধরতে হবে।

(২) বর্তমানে প্রচলিত অন্য যেকোনো আইনে কোনো মেয়াদের বা স্বল্প মেয়াদের জন্য

যেকোনোভাবে হোক না কেন, দ্বীপান্তরের উল্লেখ থাকলে সেটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

(৩) বর্তমানে প্রচলিত অন্য যেকোনো আইনে যেখানে দ্বীপান্তর উল্লেখ আছে:

(ক) সেখানে সেটি যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বুঝায়, তাহলে সেটিকে যাবজ্জীবন কারাবাস ধরতে হবে;

(খ) যদি স্বল্পতর মেয়াদের দ্বীপান্তর বোঝায়, তাহলে সেটিকে বাতিল বলে বিবেচনা করতে হবে।

৫৪. মৃত্যুদন্ড হ্রাসকরণ বা রূপান্তরকরণ - যে সকল ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়, সে সকল প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধীর সম্মতি ব্যতিরেকেই এ বিধিতে বর্ণিত অন্য যেকোনো দণ্ডে তা রূপান্তরিত করতে পারবেন।

৫৫. যাবজ্জীবন কারাদন্ড হ্রাস বা পরিবর্তন- যে সকল ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়, সে সকল প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধীর সম্মতি ব্যতিরেকেই দন্ড হ্রাস করে অনূর্ধ্ব ২০ বছর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে পরিবর্তন করতে পারবেন।

৫৫এ. রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ -৫৪ ধারা বা ৫৫ ধারার কোনো বিধান দ্বারাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন, মৃত্যুদণ্ড মওকুফ বা স্থগিত করা বা দন্ড হ্রাসের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না।

৫৭. দণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ- দণ্ডের মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশ হিসাব করার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাবাসকে ত্রিশ বছর মেয়াদী কারাবাসের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।

৬৪. জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ- যেখানে অপরাধটি কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয়, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে অপরাধীকে কারাদণ্ডসহ বা কারাদণ্ড ব্যতিরেকে জরিমানায় দণ্ডিত করা হলে, এবং যেখানে অপরাধটি কারাদণ্ডে অথবা জরিমানায়, কিংবা শুধু জরিমানায় দণ্ডনীয়, সেইক্ষেত্রে অপরাধীকে জরিমানায় দণ্ডিত করা হলে, অনুরূপ অপরাধীকে দণ্ডদানকারী আদালত দন্ডাদেশে এইরূপ নির্দেশদান করতে পারবেন যে, জরিমানা অনাদায়ে অপরাধী কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করবে এবং জরিমানা অনাদায়ের জন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত অনুরূপ কারাদণ্ড অপরাধীকে তৎপূর্বে কোনো কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়ে থাকলে সেই পূর্ব প্রদত্ত কারাদণ্ডের অতিরিক্ত স্বরূপ হবে, কিংবা কোনো দন্ডাদেশ হ্রাস বা পরিবর্তন করা হলে অপরাধী যে কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে, জরিমানা অনাদায়ের জন্য প্রদত্ত কারাদণ্ড তার অতিরিক্ত স্বরূপ হবে।

৬৫. কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে জরিমানা অনাদায়ে প্রদত্ত কারাদণ্ডের সীমা- আদালত অপরাধীকে জরিমানা অনাদায়ে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার আদেশ দান

করবেন, সেটার মেয়াদ অপরাধটির জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মেয়াদের এক-চতুর্থাংশের বেশী হবে না- যদি অপরাধটি কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হয়।

৬৬. জরিমানা অনাদায়ে প্রদত্ত কারাদণ্ডের প্রকৃতি- জরিমানা অনাদায়ে প্রদত্ত কারাদণ্ডের প্রকৃতি অপরাধটির জন্য অপরাধীকে যে ধরনের কারাদণ্ডে, দণ্ডিত করা যেত সেইরূপ হবে।

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক, ৩৯৭, ৪০১, ৪০২ এবং ৪০২এ ধারাগুলো নিম্নরূপ:

৩৫ক. (১) কেবল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ ব্যাতীত, যখন আদালত কোনও অভিযুক্তকে কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং দোষী সাব্যস্তকরণের পর এরূপ অভিযুক্তকে যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করে, যা বিনাশ্রম বা সশ্রম হতে পারে, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আসামী যত দিন কারাগারে বন্দী ছিল, তা অপরাধটির জন্য প্রদত্ত সাজা হতে বাদ দেয়া হবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে যে সময়কাল আসামী হেফাজতে ছিল, তার মেয়াদ যদি সেই অপরাধের জন্য তাকে যে সাজা প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে অপরাধী ইতোমধ্যেই কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে এবং তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা হবে, যদি না অন্য কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য তাকে হেফাজতে রাখাটা জরুরি হয়, এবং আসামীকে যদি কারাদণ্ড ছাড়াও জরিমানা প্রদানের শাস্তি দেয়া হয়, তবে জরিমানা মওকুফ হয়ে গিয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে হেফাজতের মোট সময়সীমা যদি আসামির সাজা হয় তার কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি হয়, তবে অভিযুক্তকে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হবে একবারে, যদি অন্য কোনও অপরাধের সাথে জড়িত থাকার প্রয়োজন না হয়; এবং যদি অভিযুক্তকে এই জাতীয় সাজা ছাড়াও কোনও জরিমানা প্রদানেরও সাজা দেওয়া হয়, তবে জরিমানা মঞ্জুর করা হবে।

৩৯৭. যদি কোনও ব্যক্তি যে ইতোমধ্যেই কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরের সাজা ভোগ করছে, তাকে পুনরায় দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করা হয়, তাহলে পরবর্তীতে প্রদত্ত সাজা পূর্ববর্তী সাজার সমাপ্তিতে শুরু হবে, যদি না আদালত নির্দেশ দেয় যে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাজা একত্রে চলবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তিনি ইতোমধ্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং পরবর্তীতে পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তাকে দ্বীপান্তরের শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহলে আদালত তার বিবেচনার উপর ভিত্তি করে নির্দেশ দিতে পারে যে পরবর্তী সাজাটি অবিলম্বে, অথবা পূর্ববর্তী সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শুরু হবে। আরও শর্ত থাকে যে, যদি সুরক্ষা প্রদানের খেলাপি হিসেবে ধারা ১২৩-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বলে কোনও ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত

করা হয়, তাহলে এরূপ কারাদণ্ড ভোগ করার সময় তাকে যদি পুনরায় এমন একটি অপরাধের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, যা উপরে উল্লিখিত আদেশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে পরবর্তীতে প্রদত্ত শাস্তিটি অবিলম্বে শুরু হবে।

৪০১. দণ্ড স্থগিত বা মওকুফ করার ক্ষমতা- (১) কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে সরকার যেকোনো সময় বিনা শর্তে বা দণ্ডিত ব্যক্তি যেরূপ মেনে নেয় সেরূপ শর্তে তার দণ্ড কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখতে বা সম্পূর্ণ দণ্ড বা দণ্ডের অংশ বিশেষ মওকুফ করতে পারবেন।

(২) যখন কোনও দণ্ড স্থগিত বা মওকুফ করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হয়, তখন যে আদালত উক্ত দণ্ড দিয়েছিল বা অনুমোদন করেছিল, সেই আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারককে সরকার উক্ত আবেদন মঞ্জুর করা উচিত কিংবা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করা উচিত কীনা সে সম্পর্কে তার মতামত ও মতামতের কারণ বিবৃত করতে এবং এই বিবৃতির সাথে বিচারের নথির নকল অথবা যে নথি বর্তমানে আছে সেই নথির নকল প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

(৩) যে সকল শর্তে কোনও দণ্ড স্থগিত রাখা বা মওকুফ করা হয়েছে তার কোনোটি পালন করা হয় নাই বলে মনে করলে সরকার স্থগিত বা মওকুফের আদেশ বাতিল করবে এবং অতঃপর যে ব্যক্তির দণ্ড স্থগিত রাখা বা মওকুফ করা হয়েছিল সে মুক্ত থাকলে যেকোনো পুলিশ অফিসার তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে এবং তার দণ্ডের অনতিবাহিত অংশ ভোগ করার জন্য তাকে জেলে প্রেরণ করা যাবে।

(৪) যে শর্তে এই ধারার অধীন দণ্ড স্থগিত বা মওকুফ করা হয় তা যার পক্ষে শাস্তি স্থগিত বা মওকুফ করা হয়েছে তার দ্বারা পূরণ করা হতে পারে অথবা শর্ত এমন হবে যা পূরণে সে স্বাধীন থাকবে।

(৪এ) এই বিধি বা অন্য কোনো আইনের কোনো ধারা অনুসারে কোনো ফৌজদারি আদালত কোনো আদেশ দান করলে তা যদি কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করে অথবা তার বা তার সম্পত্তির উপর দায় আরোপ করে, তাহলে উক্ত উপধারাসমূহের বিধান এই আদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা প্রদর্শন, দণ্ড স্থগিত রাখা বা কার্যকরীকরণের বিলম্ব ঘটানো বা মওকুফ করার অধিকারে এই ধারার কোনো কিছু হস্তক্ষেপ করবে না।

(৫ক) রাষ্ট্রপতি কোনো শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা মঞ্জুর করলে উক্ত শর্ত যে প্রকৃতিরই হোক না কেন তা এই আইন অনুসারে কোনো উপযুক্ত আদালতের দণ্ড দ্বারা আরোপিত শর্ত বলে গণ্য হবে এবং তদানুসারে বলবৎযোগ্য হবে।

(৬) সরকার সাধারণ বিধিমালা বা বিশেষ আদেশ দ্বারা দণ্ড স্থগিত রাখা এবং দরখাস্ত দাখিল ও বিবেচনার শর্তাবলী সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারবে।

৪০২. (১) সরকার দণ্ডিত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই নিম্নলিখিত যেকোনো দণ্ড রদবদল করে এরপরে উল্লিখিত যেকোনো দণ্ড দিতে পারবে-

মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আসামী যে সময়ের জন্য দণ্ডিত হতে পারত তার অনধিক সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড, অনুরূপ মেয়াদের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড, জরিমানা।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই পেনাল কোডের ৫৪ অথবা ৫৫ ধারার বিধানাবলীকে প্রভাবিত করবে না।

৪০২ক. সরকারকে ৪০১ ও ৪০২ ধারায় যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তা মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও প্রয়োগ করতে পারবে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রকৃতি এবং এটি কার্যকর করার পদ্ধতি এবং ফলস্বরূপ, এর কার্যকারিতা বা নির্বাহযোগ্যতার বিষয়টি রাষ্ট্রের উচ্চতর পর্যায়ে বিস্তৃত বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল প্রথমে *Kishori Lal Vs. Emperor reported in AIR 1945 (Privy Council) 64*-তে রিপোর্টকৃত মামলাটি উল্লেখ করেছিলেন। ঐ মামলাটিতে এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "সুতরাং, ভারতে দ্বীপান্তরের সাজাপ্রাপ্ত একজন বন্দীকে আন্দামানে প্রেরণ করা যেতে পারে, অথবা দ্বীপান্তরের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য নির্ধারিত ভারতের কোনো কারাগারে রাখা যেতে পারে, যেখানে তার সাথে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সাথে যেরূপ আচরণ করা হয় সেরূপই করা হবে। আপিলকারীকে আইনত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল; তিনি যখন বিচারপতি মনরো-এর কাছে আবেদন করেছিলেন তখন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন, যা এমন একটি জায়গা যেখানে দণ্ডিত বন্দীদের প্রেরণ করা হতো। এটাও যদি অনুমান করা হয় যে সাজাটি ২০ বছরের সমতুল্য এবং ভালো আচরণ সাপেক্ষে হ্রাসযোগ্য, তারপরও আবেদনের সময় তিনি মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছাড় অর্জন করতে পারেননি এবং তাই এটি যথাযথভাবে খারিজ করা হয়েছিল কিন্তু, এক্ষেত্রে এটা মনে করা উচিত হবে না যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সর্বদাই ২০ বছরের অনধিক কারাদণ্ডের সমতুল্য হবে, অথবা দণ্ডিত ব্যক্তি সর্বদাই সাজা হ্রাসের অধিকারী হবে। "

এরপর তিনি *Gopal Vinayek Godse Vs. State of Maharastra reported in (1961) 3 SCR 440*-এ রিপোর্টকৃত মামলাটির উপর নির্ভর করেছিলেন, যেটিকে এ বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের মূল রায় হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মামলাটিতে এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতীয় পেনাল কোডের ৫৭ অনুচ্ছেদের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য ধারায় এ বিধান দেয়া আছে যে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য গণ্য করা হবে। এ ধারায় এটা বলা হয়নি যে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরকে সর্বক্ষেত্রেই ২০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য গণ্য করা হবে। এমনকি সংশোধিত ধারাটিও, যার মাধ্যমে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এরূপ কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা যাবজ্জীবন

কারাদণ্ডের শাস্তি বলতে প্রাথমিকভাবে দণ্ডিত ব্যক্তির বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ডকে বোঝানো হয়।" দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে হবে

এরপর তিনি *State of Madhya Pradesh Vs. Ratan Singh and others reported in (1976) 3 SCC 470*-এ রিপোর্টকৃত মামলাটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যেখানে এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের বিধিবদ্ধ বিধানগুলি হতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হয়: (১) ২০ বছরের সমাপ্তিতেই ছাড়সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায় না, কেননা বিভিন্ন জেল ম্যানুয়াল বা কারা আইনের অধীন প্রশাসনিক বিধানগুলি ভারতীয় পেনাল কোডের বিধিবদ্ধ বিধানকে অতিক্রম করতে পারে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ হলো দণ্ডিত ব্যক্তির বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ড, যদি না উপযুক্ত সরকার কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারার অধীনে সম্পূর্ণ সাজা বা এর অংশবিশেষ মওকুফ করার বিবেচনাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে; (২) নি:সন্দেহে উপযুক্ত সরকারের এরূপ সাজা হ্রাস অথবা বাতিল করার বিবেচনাধীন ক্ষমতা রয়েছে এবং যখন এরূপ সাজা হ্রাস করতে অস্বীকার করা হয়, তখন রাজ্য সরকারকে বন্দী মুক্তির নির্দেশ দেয়ার জন্য কোনও রিট পিটিশন জারি করা যাবে না; (৩) কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারার অধীনে যে উপযুক্ত সরকার সাজা হ্রাস করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তা হলো রাজ্য সরকার, যেখানে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সাজা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ স্থানান্তরকারী রাজ্য এবং বদলি রাজ্যটি নয়, যেখানে বন্দীকে প্রিজনারস অ্যাক্ট এর অধীনে তার ইচ্ছায় স্থানান্তরিত করা যেতে পারে; এবং (৪) যখন বদলি রাজ্যটি মনে করে যে, দণ্ডিত ব্যক্তি ২০ বছর সাজা ভোগ করেছে, তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে বদলি রাজ্যটি একটি অনুরোধপত্র পাঠায়, অর্থাৎ সে রাজ্যের সরকার যেখানে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা প্রদান করা হয়েছিল এবং এরূপ অনুরোধ যদি রাজ্য সরকার কর্তৃক বাতিলও হয়ে যায়, রাজ্য সরকারের এরূপ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোনো রিট পিটিশন করা যাবে না।

Maru Ram Vs. Union of India reported in (1981) 1 SCC 107-এ রিপোর্টকৃত মামলায় বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণা আইয়ার পর্যবেক্ষণ করেন যে, "একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ, সুববা রাও, জে এর মাধ্যমে এই মতামত দিয়েছিল যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থাকার চেয়ে কম কিছু নয় এবং এটা ব্যাতীত অন্য কিছু নয়।" যেহেতু মৃত্যু অনিশ্চিত ছিল, সেহেতু ছাড়ের মাধ্যমে সাজা হ্রাসের ফলে মুক্তির কোনও স্পষ্ট তারিখ পাওয়া যায়নি এবং গডসের প্রার্থনাটিও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রকৃতি হলো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারাবাস, দীর্ঘকালীন ছাড় জমা হওয়ার কারণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের যথাযথ শাস্তি বিপন্ন হতে পারে না। শুধুমাত্র কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ ধারা (১৯৭৩-এর কোডের ৪৩২ ধারার অনুরূপ)-এর অধীনে উপযুক্ত সরকার কর্তৃক অথবা সংবিধানের ৭২ অথবা ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমার আদেশের ভিত্তিতে মুক্তি প্রদান করা যাবে। গডসে (পূর্বোল্লিখিত) এই প্রস্তাবের কারণ "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো এরূপ কারাদণ্ড যা দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনের অবশিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।" আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য গণ্য করা হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৫৫ ধারা এবং বিভিন্ন ক্ষমা প্রকল্পের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করা হয়েছিল। আমাদের যা বলা দরকার তা হলো, গডসেতে এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে এই সমতাগুলি গণনার সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যা রাষ্ট্রকে এর ক্ষমা

প্রদানের বিস্তৃত ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা করে। এমনকি যদি অর্জিত ক্ষমা ২০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে, তবুও রাজ্য সরকার কয়েদীকে মুক্তি দিতে পারে, আবার নাও দিতে পারে, এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বাকি অংশ মার্জনা করে মুক্তির আদেশ না দেয়া পর্যন্ত, বন্দী তার স্বাধীনতা দাবি করতে পারবে না। এর কারণ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সারা জীবনব্যাপী কারাদণ্ডের চেয়ে কম কিছু নয়। তদুপরি, তখনকার এবং এখনকার শাস্তি একই - আজীবনব্যাপী এবং সাজাটি যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, তখন ছাড় মুক্তির কোনোরূপ অধিকার সৃষ্টি করে না। অপরাধের জন্য আইনে নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে বৃহত্তর কোনো শাস্তি ৪৩৩এ ধারার অধীনে আরোপ করা হয় না। ১৪ বছর কারাবন্দী থাকলেও ক্ষমা পাওয়ার কোনো অর্পিত অধিকার সৃষ্টি হয় না, যখন আমরা বুঝতে পারি যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো এমন একটি শাস্তি, যা পুরো জীবনের জন্য প্রযোজ্য।"

পরিশেষে, বিচারপতি কৃষ্ণা আয়ার বলেন যে, "আমরা ৪৩৩এ ধারার উপর সমস্ত চাপ প্রতিহত করি। সম্ভবত, কারাবিদ্যা অনুযায়ী, ধারা দ্বারা নির্ধারিত দীর্ঘমেয়াদসমূহ অতিরিক্ত। সুযোগ থাকলে আমরা সংস্কারের জন্য ১৪ বছর অপেক্ষা করতাম না। কিন্তু আমাদের কাজ হলো ব্যাখ্যা করা, প্রণয়ন করা নয়; পাঠোদ্ধার করা, পাঠ্যক্রম তৈরী করা নয়।" "আমরা সংবিধানের ৭২ এবং ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীন পাশকৃত সমস্ত ক্ষমা এবং স্বল্পমেয়াদী সাজাসমূহকে বহাল রাখছি, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে তখনই মুক্তি প্রদান করা হবে যখন সরকার সম্মিলিত বা ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্দেশ্যে একটি আদেশ জারি করেন।"

"আমরা মনে করি যে, ধারা ৪৩২ এবং ধারা ৪৩৩ সংবিধানের ৭২ এবং ১৬১ অনুচ্ছেদের বহি:প্রকাশ নয়, এটি একটি পৃথক, কিন্তু অনুরূপ ক্ষমতা, এবং ধারা ৪৩৩ এই পূর্ববর্তী বিধানসমূহকে পরিপূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল করার মাধ্যমে সংবিধানের অধীনে ক্ষমা প্রদর্শন, সাজা হ্রাস এবং অনুরূপ যে ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোর লঙ্ঘন সৃষ্টি করে না"

"আমরা গডসের (পূর্বোল্লিখিত) মামলাটি অনুসরণ করে এই মতামত ব্যক্ত করছি যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা অবধি বহাল থাকবে, এবং যে পরিমাণ ক্ষমাই অর্জিত হোক না কেন, বন্দী তখনই কেবল মুক্তি দাবি করতে পারবে যখন সরকার কর্তৃক অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়।" "আমরা ঘোষণা করছি যে, ৪৩৩এ ধারাটির উভয় অংশই (অর্থাৎ, ধারায় উল্লিখিত উভয় ধরণের কারাদণ্ড) কার্যকর হতে পারে। এ বিষয়টি সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, যাদের মামলাগুলো ১৯৭৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বরের পূর্বে (প্রত্যক্ষ বা প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে, রায়ে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) ধারা ৪৩৩এ কার্যকর হওয়ার সময় বিচারিক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক ন্যূনতম ১৪ বছরের প্রকৃত কারাবাস পরিচালিত হবে না। সমস্ত "জীবিত ব্যক্তি" যাদেরকে ঐ তারিখের পূর্বে বিচারিক আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তারা অর্জিত ক্ষমার ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক মুক্তির জন্য বিবেচিত হওয়ার অধিকারী, যদিও মুক্তি কেবল তখনই ঘটবে যখন সরকার এ বিষয়ে একটি আদেশ প্রদান করবে। এ পর্যন্ত টেনসেস-এর যুদ্ধটি কারাবন্দীরাই জিতে যায়। একই যুক্তি অনুসারে এটা ব্যক্ত করা যায় যে, যদি সংক্ষিপ্ত সাজা প্রদানকারী কোনো আইন থেকে থাকে, তবে এরূপ আইনের অধীনে বন্দী মুক্তি দাবি করতে পারে, যদি বিচারিক আদালত কর্তৃক তার দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশটি ধারা ৪৩৩এ কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রদান করা হয়।" "আমাদের দৃষ্টিতে, মানবিক দণ্ড এবং পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা সুরক্ষা সাপেক্ষে উদারপন্থী প্যারোলের নিশ্চয়তা দেয় এবং বন্দীদের জন্য অন্যান্য মানবিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়, যার মাধ্যমে গণকারাগারগুলো চিড়িয়াখানায় পরিণত হয় না এবং

মানুষের মর্যাদা এবং মূল্য অক্ষত থাকে। মানবাধিকার সচেতনতার প্রেক্ষিতে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বিকল্পগুলির সন্ধান করতে হবে।"

Kartar Singh and others Vs. State of Hariyana reported in (1982) 3 SCC 1-এ রিপোর্টকৃত মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে, প্রথমত, ভারতীয় পেনাল কোড এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের বেশ কিছু ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, উভয় বিধিই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ডের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখে, প্রকৃতপক্ষে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" এবং "একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড"- এ দুই অভিব্যক্তি একই ধারায় একে অপরের বৈপরীত্যপূর্ণ অবস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে পূর্বেরটির অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির বাকি জীবনের জন্য কারাদণ্ড (উৎস: ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় উল্লিখিত "জীবন"-এর সংজ্ঞা) এবং পরবর্তীটির অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড। উদাহরণস্বরূপ, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০৪ ধারায় বলা আছে যে, নিন্দনীয় নরহত্যা যা খুন নয়-এর শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা যেকোনো ধরনের কারাদণ্ড, যা ১০ বছরে মেয়াদী হতে পারে। ৩০৫ ধারায় বলা আছে যে, কোনো শিশু বা অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তির আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিলে এর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১০ বছরের অনুর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ড। ৩০৭ ধারায় বলা আছে যে, প্রকৃত আঘাতের সাথে হত্যাকান্ড ঘটানোর চেষ্টা করার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা যেকোনো ধরণের কারাদণ্ড যা ১০ বছর মেয়াদী হতে পারে; আবার, ডাকাতি করতে গিয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করলে তা ৩৯৪ ধারার অধীনে দণ্ডনীয়, এক্ষেত্রে শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০ বছর মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৫৫ ধারা একে অপরের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ স্বতন্ত্রতায় দুটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করে এবং প্রকাশ করে যে, কোন একটি উপযুক্ত সরকার চাইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় গৃহীত হয়েছে এমন প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে উক্ত সাজা কমিয়ে চৌদ্দ বছরের কম মেয়াদী কারাদণ্ডে পরিণত করতে পারে; একইভাবে, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪৩৩ (বি) ধারা একে অপরের সাথে বৈপরীত্য স্বতন্ত্রতায় এই দুটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করে। উভয় কোডে যে ধরনের পার্থক্য বজায় রাখা হয়েছে তা বিবেচনা করে অতি সহজেই এই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জীবন-ব্যাপী কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত করা যাবে না অথবা, এটি বলা যাবে না যে, যেকোন অভিযুক্তের জীবনকাল অনির্দিষ্ট হওয়ায় এই দুই ধারায় বর্নিত শব্দগুলো পরস্পর বিনিময়যোগ্য হিসেবেও বোঝা যাবে। এছাড়াও, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারা ৫৭ বা জেল ম্যানুয়ালে থাকা রেমিশন বিধিগুলি এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৫৭ ধারার বিধানে বলা হয়েছে যে, সকল উদ্দেশ্যে নয়, বরং সাজার মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার উদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য বর্ণিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা হবে; একইভাবে, জেল ম্যানুয়ালে থাকা রেমিশন বিধিগুলি পেনাল কোডের অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে দণ্ডিত দোষী ব্যক্তির বাকি জীবন কারাদণ্ড বোঝাতে হবে। *Pandit Kishori Lal* মামলার প্রিভি কাউন্সিল এবং *Gopal Godse* মামলার এই আদালত এই বিষয়টি চিরকালের জন্য নিষ্পত্তি করেছেন এই মতামতের প্রেক্ষিতে যে, যাবজ্জীবন নির্বাসন বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে অবশ্যই দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য নির্বাসন বা কারাদণ্ড হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই আদালত পরবর্তীতে *Ratan Singh* মামলা (পূর্বোল্লিখিত) এবং *Maru Ram* মামলায় (পূর্বোল্লিখিত) এই মতামতটি অনুমোদন এবং অনুসরণ করেছেন। বিষয়টির উপর উক্ত মতামত অনুসারে, যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারার পরিধির মধ্যে পড়বেন না। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে,

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪২৮ ধারায় ধৃত সেট অফের সুবিধা যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

তাঁর পরবর্তী উদ্ধৃতি হল *Ashok Kumar @ Gulu Vs. Union of India and others reported in* (*1991*) *3 SCC 498* মামলাটি নিয়ে। উক্ত মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "এরপর আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী নিবেদন করেন যে, *Bhagirath* -এর মামলায় ৪২৮ ধারার সেট অফের সুবিধাকে কারাদণ্ডকাল গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত বিষয় হিসেবে অনুমতি প্রদান করে এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরে *Godse* মামলার সিদ্ধান্তের যুক্তিসমূহ অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা এই বক্তব্যের কোনও ভিত্তি দেখতে পাই না। *Godse* মামলায়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামি অন্তরীন থাকার সময় ২৯৬৩ দিনের কারাদণ্ড মওকুফ পেয়েছিলেন। তিনি দাবি করেন যে, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৫৭ ধারা সাথে ৫৩এ ধারা অনুসারে, তার কারাবাসের মোট সময়কাল ২০ বছরের বেশি হতে পারে না যা তিনি মওকুফসহ সম্পন্ন করেছিলেন এবং তাই তাকে অব্যাহত আটক রাখা অবৈধ ছিল।" "ভারতীয় পেনাল কোডের ৫৭ ধারার সাথে আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নের কোনও প্রকৃত সংশ্লিষ্টতা নেই। এই ধারায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে, সাজার মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য যাবজ্জীবন নির্বাসনকে বিশ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য গণ্য করতে হবে। এই ধারা এটি বলে না যে, যাবজ্জীবন নির্বাসনকে সকল উদ্দেশ্যে বিশ বছরের জন্য নির্বাসন হিসেবে গণ্য করা হবে; বা সংশোধিত ধারায় "যাবজ্জীবন নির্বাসন" শব্দগুলির পরিবর্তে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দগুলির ব্যবহারও এরকম কোন সর্বব্যাপী কল্পিত ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না। যাবজ্জীবন নির্বাসন বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা প্রাথমিকভাবে অবশ্যই দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য নির্বাসন বা কারাবাস হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫৭ ধারার এই ব্যাখ্যাটি আরও জোরদার হয় যদি আমরা ভারতীয় পেনাল কোডের ৬৫, ১১৬, ১২০ এবং ৫১১ ধারা উল্লেখ করি যা মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ হিসাবের জন্য উক্ত ধারাসমূহের অধীন কারাদণ্ডের মেয়াদ নির্ধারণ করে। এই ভগ্নাংশ হিসাব করার জন্যই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসাবে গণনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যদি এ ধরনের বিধান না করা হত তবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আকারে ভগ্নাংশ হিসাব করা অসম্ভব হত। পূর্বোল্লিখিত ধারা সমূহে বর্ণিত সাজার মেয়াদের ভগ্নাংশ হিসাব করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসেবে একটি মেয়াদ উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল।"

তার পরবর্তী উদ্ধৃত মামলাটি *Subash Chander Vs. Krishan Lal and others reported in* (*2001*) *4SCC 458*, যেখানে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, "তবে, এই মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে, ভবিষ্যতে সুভাষ চন্দর ও তার পরিবারের জীবন আসন্ন বিপদের আশঙ্কা ধরে রেখে, কৃষ্ণ লাল এর পক্ষে দেওয়া বিবৃতি বিবেচনায় নিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তার বাকি জীবন কারাগারে কারাদণ্ড হিসেবে গণ্য হবে। তিনি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৪০১, প্রিজনারস অ্যাক্ট, জেল ম্যানুয়াল বা সাজা লঘুকরণ ও মউকুফের উদ্দেশ্যে করা অন্য কোনও আইন এবং বিধি এর অধীনে কোনও সাজা লঘুকরণ বা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী হবেন না।"

Swamy Shraddananda @ Murali Monohar Misra (*2*) *Vs. State of Karnataka reported in* (*2008*) *13 SCC 767* মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এই পর্যবেক্ষণ করেছে যে,

"এই পর্যায়ে, সাজা প্রদান এবং গণনা, সাজা মওকুফ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানগুলি সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ করা দরকার। পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় "জীবন"-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে মানুষের জীবনকে বোঝানোর জন্য, যদি না প্রসঙ্গ থেকে এর বিপরীত কিছু প্রকাশিত হয়। ৫৩ ধারায় সাজার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি মৃত্যুদণ্ড এবং দ্বিতীয়টি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ৫৪ এবং ৫৫ ধারা যথাযথ সরকারকে যথাক্রমে মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লঘুকরনের ক্ষমতা প্রদান করে। ৫৫ ধারায় "উপযুক্ত সরকার" সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ৫৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, সাজার মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার সময়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে বিশ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা হবে। বহু সিদ্ধান্তের দ্বারা এটি চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত যে, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজার অর্থ হল দণ্ডিত ব্যক্তির বাকি জীবন জন্য কারাদণ্ড।"

এখানে আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে,

"এটি সমভাবে সু-মীমাংসিত যে, পেনাল কোডের ৫৭ ধারা কোনওভাবেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা বিশ বছরের মেয়াদে সীমাবদ্ধ করে না। ৫৭ ধারা কেবলমাত্র সাজার মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার জন্য এবং এটি এই বিধান দেয় যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিশ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসাবে গণনা করা হবে। *Gopal Vinayak Godse* (পূর্বোল্লিখিত) *and Ashok Kumar alias Golu* (পূর্বোল্লিখিত)। ৫৭ ধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেনাল কোডের ৬৫, ১১৬, ১১৯, ১২৯ ও ৫১১ ধারা উল্লেখ করলেই স্পষ্ট হবে।"

"এগুলো আমাদের সাজা গণনা এবং ক্ষমা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়। গণনা, ক্ষমা, স্থগিতকরণ ইত্যাদির বিধানগুলি সংবিধান এবং আইন উভয়ের ভিতরেই খুঁজে পাওয়া যায়। সংবিধানের ৭২ এবং ১৬১ অনুচ্ছেদে সাজা ক্ষমা করা, পুনরুদ্ধার করা, বিরতি প্রদান বা সাজা হ্রাস করার অথবা কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সাজা স্থগিত, ক্ষমা বা লঘু করা করার জন্য যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যের গভর্নরদের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটি একেবারে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, এই রায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতির বিষয়ে থাকা সংবিধানিক বিধানগুলির সাথে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়। এরপরে যা বলা হয়েছে তা কেবল কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এবং কারাগার আইন ও বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক প্রণীত বিধিগুলির মধ্যে থাকা সাজা হ্রাসকরণ, ক্ষমা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত।"

এখানে আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে,

"কারাগার আইন ও বিধি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ভাল আচরণ এবং কারাগারের অভ্যন্তরে কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য বন্দীদের মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে কিছু দিনের সাজা হ্রাস করা হয়। একজন বন্দীর অর্জিত ক্ষমার দিনগুলি তার প্রকৃত কারাবাসের সময়কালের (বিচারকালীন সময়ে কারাবাস সহ) সাথে যুক্ত করা হয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজার মেয়াদ বহাল রাখার জন্য। এই অবস্থায়, প্রথম প্রশ্নটি যা মনে আসে তা হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের

ক্ষেত্রে কীভাবে সাজা হ্রাসের বিষয়টি প্রয়োগ করা হয়। যেভাবে সাজা হ্রাস করা হয় তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে কারাদণ্ডের জন্য প্রযোজ্য এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাকি জীবনের জন্য হওয়ায় তা প্রাকৃতিকভাবেই অনির্দিষ্ট।"

এরপর মিঃ আলম *Union of India Vs. V. Sriharan @ Marugan and others reported in* (*2016*) *9SCC 541* মামলার উদ্ধৃতি দেন। উক্ত মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, "৫৩ ধারায় আইপিসি বিভিন্ন ধরণের শাস্তির উল্লেখ করেছে এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় "জীবন" শব্দটিকে একটি মানুষের জীবন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যদি না এর বিপরীত কিছু প্রসঙ্গ থেকে প্রতীয়মান হয়। একজন মানুষের জীবন সে যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, যা প্রাকৃতিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। *Godse* এবং *Maru Ram* -এর মামলার সিদ্ধান্তে উল্লিখিত আইন, যা ধারাবাহিকভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যখ্যায় অনুসারিত হয়েছে, আইপিসির সেই ৫৩ ধারার সাথে ৪৫ ধারার বিধান অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির বাকি জীবন বা অবশিষ্ট জীবনকালব্যাপী কারাদণ্ড। এই সাজার শেষ সময় হল সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির শেষ নিঃশ্বাস এবং যদি না উপযুক্ত সরকার উক্ত সাজা ক্ষমা করে বা উক্ত সাজা হ্রাস করে উক্ত শেষ সময় পরিবর্তিত হবে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ বন্দির বাকি জীবন কারাদণ্ড।"

অন্যদিকে, খন্দকার মাহবুব হোসেন আবেদকের পক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রথমে *Union of India* (*UOI*) *and others Vs. Dharam Pal* (*MANU/SC/0627/2019*) মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন। উদ্ধৃত মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, "আমাদের বিবেচিত মতামত অনুসারে, ঘটনা ও পরিস্থিতির সামগ্রিকতা এবং মামলায় উল্লিখিত কারণগুলির ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যে কারাবাসের সময়কাল সহ মোট প্রকৃত কারাবাস ৩৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে রেস্পন্ডেন্টকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়াই উপযুক্ত হবে।"

এরপরে তিনি *Sachin Kumar Singhraha Vs. State of Madhya Pradesh reported in AIR 2019 SC 1417* মামলার উদ্ধৃতি দেন। উক্ত মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে,

"সুতরাং, মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতির সামগ্রিকতা সম্পর্কে আমরা মতামত দিচ্ছি যে, এই অপরাধটি সেই ধরনের মামলার অন্তর্গত নাও হতে পারে যেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা প্রয়োজন হয়। তবে উপরে বর্ণিত অপরাধের সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে আমরা অনুভব করি যে, এই মামলায় যাবজ্জীবন বিনাশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিলে তা পুরোপুরিভাবেই অপর্যাপ্ত হবে। এই ক্ষেত্রে, আমরা *Parsuram v. State of M.P.* (*Criminal Appeal Nos. 314315 of 2013*) মামলায় ১৯/২/২০১৯ তারিখের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে উল্লিখিত অহ্রাসযোগ্য সাজা সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই:

"Swamy Shraddananda (*2*) *v. State of Karnataka,* (*2008*) *13 SCC 767* মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং পরবর্তীকালে *Union of India v. V. Sriharan* , (*2016*) *7 SCC 1* মামলায় এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এই আদালত বৈধভাবেই মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে ১৪ বছরের বেশি মেয়াদের কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করতে পারেন এবং এই ধরনের সাজা ছাড়ের বাইরে রাখতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে এই

আদালত এই ধরনের সাজা প্রদান করেছে এবং আমরা উদাহরণস্বরূপ এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কয়েকটি কার্যকরভাবে উল্লেখ করতে পারি। *Sebastian alias Chevithiyan v. State of Kerala* , (*2010*) *1 SCC 58* মামলাটি ছিল ২ বছরের এক মেয়ে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা সম্পর্কিত একটি মামলা, এই আদালত আপিলকারীর সাজা পরিবর্তন করে তার বাকি জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। *Raj Kumar v. State of Madhya Pradesh* , (*2014*) *5 SCC 353* মামলাটি ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীর ধর্ষণ ও হত্যা সম্পর্কিত একটি মামলা, যেখানে এই আদালত আপিলকারীকে কোন ধরনের অব্যাহতি ছাড়াই ন্যূনতম ৩৫ বছর কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। *Selvam v. State* , (*2014*) *12 SCC 274* মামলাটি ৯ বছরের কিশোরীর ধর্ষণ সম্পর্কিত একটি মামলা, যেখানে এই আদালত বিনা ছাড়ে ৩০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। *Tattu Lodhi v. State of Madhya Pradesh* , (*2016*) *9 SCC 675* মামলায় অভিযুক্তকে ৭ বছর বয়সী নাবালিকা মেয়েকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যেখানে আদালত এই নির্দেশনা সহ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছিলেন যে, ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যেন তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া না হয়।

বর্তমান বিষয়টিতেও আমরা সর্বনিম্ন ২৫ বছরের কারাদণ্ডসহ (ছাড় ছাড়াই) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করা যথাযথ বলে মনে করি। ইতোমধ্যে অভিযুক্ত/আপিলকারীর ভোগকৃত প্রায় চার বছরের হাজতবাস এই কারাদণ্ড থেকে বাদ যাবে। আমরা অভিযুক্ত/আপিলকারীর বয়সের বিষয়ে যথাযথ বিবেচনা করার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যা বর্তমানে প্রায় ৩৮ থেকে ৪০ বছর।"

তদনুসারে, নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করা হয়:

"ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩৭৬(এ), ৩০২ এবং ২০১ (*II*) ধারার অধীনে এবং *POCSO Act* -এর ৫(*i*)(এম) ধারা সহ ৬ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য অভিযুক্ত/আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বহাল রেখে হাইকোর্টের প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল থাকবে। তবে, সাজা পরিবর্তন করা হল। এতদ্বারা, অভিযুক্ত/আপিলকারীকে ২৫ বছরের কারাদণ্ডের (ছাড় ব্যাতীত) সাজা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হল। ইতোমধ্যে ভোগকৃত সাজা সেট অফ করা হবে। সেইমতে এই আপীলগুলো নিষ্পত্তি করা হল।"

Shri Bhagwan Vs. State of Rajasthan (*2001*) *6 SCC 296* মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

"সুতরাং, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আমরা আপিলকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের সাজা হ্রাস করছি এবং এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, আপিলকারী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করবেন। আমরা আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে, ইতোমধ্যে ভোগকৃত হাজতবাস সহ কমপক্ষে ২০ বছরের কারাদণ্ড পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপিলকারী কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন না।"

Prakash Dhawal Khairnar (*Patil*) *Vs. State of Maharashtra* সহ *State of Maharashtra Vs. Sandeep @ Babloo Prakash Khairnar* (*Patil*) (*2002*) *2 SCC 35* মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে,

> "এছাড়াও, এই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্থগিত রেখেছি এবং নির্দেশ দিচ্ছি যে, হত্যার অপরাধের জন্য, তিনি ইতোমধ্যে ভোগকৃত হাজতবাসের সময়কালসহ কমপক্ষে ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করবেন।"

Ram Anup Singh and Ors. vs. State of Bihar (*2002*) *6 SCC 686* মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের তিন বিচারকের বেঞ্চ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

> "সুতরাং, আমরা সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি যত্ন সহকারে বিবেচনা করে আমরা মনে করি যে, এই মামলায় মৃত্যুদণ্ড ন্যায্য হবে না। অতএব, আমরা বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক বহালকৃত আপিলকারী ললন সিং ও বাববান সিংয়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্থগিত করছি। এর পরিবর্তে আমরা তাদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে প্রদান করছি এই শর্তে যে, ইতোমধ্যে ভোগকৃত হাজতবাসের সময়কাল সহ ২০ বছরের প্রকৃত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে না।"

Nazir Khan and Ors. vs. State of Delhi (*2003*) *8 SCC 461* মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, "অপরাধের গুরুত্ব এবং যে কাজগুলি করা হয়েছে এবং তার পরিণতির ভয়াবহ প্রকৃতি বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে ২০ বছরের জন্য কারাদণ্ড উপযুক্ত হবে। অভিযুক্ত আপিলকারীরা উপরোক্ত ২০ বছরের সময় থেকে কোনও ছাড় পাবেন না।"

Haru Ghosh Vs. State of West Bengal (*2009*) *15 SCC 551* মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

> "এক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোন সাজা প্রদান করা উচিত। স্বাভাবিকভাবে, এটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হত। তবে, আপিলকারী/আসামির জন্য এটি কোনও সাজা নয়, কারণ তিনি ইতোমধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ছায়ায় রয়েছেন, যদিও তাকে হাইকোর্ট জামিন দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের মতে, *Swamy Shraddananda* (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় এই আদালত কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি গ্রহণ করাই ভাল হবে, যেখানে আদালত এক অংশে মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে ব্যবধানকে উল্লেখ করেছে, যা আসলে ১৪ বছরের কারাদণ্ড। উক্ত মামলায় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আসামিকে অবশ্যই তার বাকি জীবন বা আদেশে বর্ণিত মূল মেয়াদ পর্যন্ত কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত নয়।

> আমরা আপিলকারী/আসামিকে তার বাকি জীবনের জন্য কারাগারে প্রেরণের প্রস্তাব করছি না; তবে, আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো, আপিলকারী/আসামির ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে প্রকৃত হাজতবাস ৩৫ বছরের কম হবে না, যার অর্থ, আপিলকারী/আসামিকে ন্যূনতম ৩৫ বছরের জন্য কারাগারে থাকতে হবে।"

Ramraj @ Nanhoo @ Bihnu Vs. State of Chhattisgarh (*2010*) *1 SCC 573* এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, "বর্তমান ক্ষেত্রে, ঘটনাগুলি এমন যে আবেদনকারীর মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়ার বিষয়ে ভাগ্যবান। আমরা মনে করি না যে, এটি এমন কোনও উপযুক্ত মামলা যেখানে আবেদনকারীকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের পরে মুক্তি দেওয়া উচিত। ক্ষমাপ্রাপ্তিসহ ২০ বছরের কারাদণ্ড পূর্ণ হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর মামলাটি মেয়াদপূর্ব মুক্তির জন্য বিবেচনায় নিতে পারে।"

Neel Kumar @ Anil Kumar Vs. The State of Haryana (*2012*) *5 SCC 766* মামলায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে,

> "সুতরাং, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল করেছি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছি। মেয়াদপূর্ব মুক্তির বিবেচনা করার পূর্বে আপিলকারীকে কোন ছাড় ছাড়াই ন্যূনতম ৩০ বছর জেল খাটতে হবে।"

Sandeep Vs. State of UP (*2012*) *6 SCC 107* মামলায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল:

> "উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনায় গ্রহণ করে এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলিও মাথায় রেখে এই মামলায় অভিযুক্ত সন্দীপকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যথাযথ হবে না মর্মে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সময় আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, মেয়াদপূর্ব মুক্তির বিবেচনা করার পূর্বে অভিযুক্ত সন্দীপকে কোনও ছাড় ছাড়াই ন্যূনতম ৩০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।"

Gurvail Singh @ Gala and Anr. vs. State of Punjab (*2013*) *2 SCC 713* মামলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে,

> "এই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিগুলির সামগ্রিকতা বিবেচনা করে আমরা মনে করি যে আপিলকারীদের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়টি যথাযথ হয়নি তবে আপিলকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সময় আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে কোন ছাড় ছাড়াই তাদেরকে কমপক্ষে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এবং হাইকোর্ট অনুমোদিত সাজা উপরোল্লিখিত মতে সংশোধিত হলো। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা সাজাটি মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করলাম। *Sandeep* (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় এই আদালতের দেওয়া নীতিটি প্রয়োগ করে আমরা মনে করি যে, এই মামলার ঘটনা বিবেচনায় ত্রিশ বছরের ন্যূনতম সাজাই যথেষ্ট শাস্তি হবে।"

> ‘‘এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এটা স্পষ্ট যে, অনেক মামলাতেই যখনই মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে যেখানে অভিযুক্তের অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর, সেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সময় এই আদালত ন্যূনতম ২০ বছর বা ২৫ বছর বা ৩০ বছর বা ৩৫ বছর নূন্যতম কারাদণ্ডের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এরপর আরও উল্লেখ করেন যে, উপযুক্ত কোন সরকার যদি ছাড় দিতে চায় তবে উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই তারা এই বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবে।’’

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আমাদের অপরাধতাত্ত্বিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে যা সাজা দেওয়ার জন্য উপলব্ধ সবচেয়ে কঠোর শাস্তির মধ্যে একটি। ১৮৬০ সালে পেনাল কোডে এই শাস্তি কার্যকর হওয়ার অনেক আগে, ‘‘জেনারেল রেগুলেশন’’-এর অধীনে কিছু গুরুতর অপরাধের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার কর্তৃক যাবজ্জীবন নির্বাসনকে এক প্রকার শাস্তি হিসেবে মঞ্জুর করা হয়, যেক্ষেত্রে অপরাধীকে নির্বাসনে পাঠানো হত। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৭ সালে এস ডব্লিউ সুমাত্রার বেনকুলেনে ভারতীয় অপরাধীদের প্রথম ব্যাচকে শাস্তির জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের পর খুব শীঘ্রই আন্দামানে নির্বাসন শুরু হয়। বন্দিরা কোম্পানির ভারতীয় অঞ্চল থেকে নির্বাসিত হত এবং পরে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে আগত বন্দীদের আটাশ ভাগেরও বেশি ব্রিটিশ ভারত থেকে আসত। বলা হত যে, নির্বাসন ছিল একটি ‘‘অসাধারণ শক্তির অস্ত্র’’ কেননা ‘‘কালো পানি অতিক্রম করা’’ ছিল ‘‘অবর্ণনীয় ভীতিকর’’ একটি বিষয়। ১৮১১ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, আর কোনও বন্দীকে বাংলা থেকে নির্বাসিত করা হবে না। গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত বন্দিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হবে এবং তাদের তৎকালীন নবনির্মিত আলিপুর কারাগারে রাখা হবে। এই নীতি ১৮১৩ সালের মধ্যে বর্জন করা হয়, কারণ কারাগার অতিরিক্ত জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। নির্বাসন পুনরায় চালু হয় এবং মরিশাসের ব্রিটিশ অধিগ্রহণের সাথে সাথে এটি আরও গতি অর্জন করে। সেখানে ১৮১৫ থেকে ভারতীয় বন্দীদের সেখানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৮১৭ সালে, ভারতে নির্বাসনকে আরও অনেক অপরাধের শাস্তি করা হয়। ১৮২৬ সালের মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিও বন্দীদের মরিশাসে পাঠানো শুরু করে। ১৮৩৭ সালে, বিষয়টি অবিলম্বে কার্যকর না হলেও, ভারতীয় পেনাল কোডের খসড়া এবং ১৮৩৮ সালে কমিটির প্রতিবেদন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে নির্বাসনের পক্ষে শক্তিশালী অগ্রাধিকার প্রকাশ করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কয়েক বছর পরে দেখা গেছে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বন্দীদের আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ১৯২১ সালে ভারতীয় জেল কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেছিল যে, কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেলের বিশেষ বা সাধারণ আদেশ ব্যাতীত এই বন্দীদের আন্দামানে নির্বাসন বন্ধ করা উচিত। বন্দীদের সাথে দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত ছিল এবং সেই বছর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল যে, আন্দামানের বন্দিশিবির ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করা হবে। পরের এক দশকে আন্দামানে বন্দীদের সংখ্যা যখন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছিল, বন্দী প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসে ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৯১৯ সালে ভারত সরকার আইন পাস হওয়ার পর থেকে কারাগারগুলি প্রদেশগুলির দায়িত্বে চলে যায়। ফলস্বরূপ, যদিও ভারতের ব্রিটিশ সরকার বেশিরভাগ নির্বাসনের অবসান ঘটানোর সংকল্প করেছিল, তথাপি তারা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দোষীদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করার ক্ষমতা আইনত তাদের ছিল না। এমনকি বন্দীশিবির বন্ধের ঘোষণার এক দশক পরেও ১৯৩২ সালে ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট উল্লেখ করেছিলেন যে আন্দামান সেলুলার জেল খোলা থাকবে। ১৯৪৪ সালে প্রিভি কাউন্সিল যখন *Kishori Lal v. King Emperor* মামলার শুনানী করছিল, তখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জগুলি জাপানি দখলে ছিল। মামলাটি ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত একজন বন্দীর

বিষয়ে, যিনি চৌদ্দ বছরেরও বেশি সময় কারাভোগের পর থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। যদিও তাকে নির্বাসনের সাজা দেওয়া হয়েছিল, তাকে নির্বাসিত করা হয়নি এবং তিনি লাহোর কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন বন্দীর মত শৃঙ্খলায় তিনি কারাভোগ করেন। প্রিভি কাউন্সিল রায় দেয় যে, "নির্বাসনের শাস্তির ক্ষেত্রে আর বন্দিদের বিদেশে প্রেরণ করা বা এমনকি যে প্রদেশগুলিতে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল তার বাইরেও প্রেরণ করা আবশ্যক নয়।" এটি স্বীকার করে যে, "বর্তমানে ভারতে নির্বাসন দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরই একটি নাম।" নির্বাসনের দণ্ডে দণ্ডিত একজন বন্দীকে ভারতের কারাগারে রাখতে হবে এবং বন্দীরা এমন শৃঙ্খলায় থাকবে যেন তাদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এর সাথে, প্রিভি কাউন্সিল অনির্বাসিত বন্দীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং কঠোর পরিশ্রমের অধীন থাকা বন্দী হিসেবে অনুমোদন দেয়। ভারতে ১৯৫৬ সালের পর থেকে নির্বাসন আইন সংক্রান্ত কোন বইতেও আর শাস্তি হিসেবে দেখা যায় না। এটি সম্ভবত "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" এর শাস্তির প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল, নির্বাসন সংক্রান্ত সকল প্রসঙ্গে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" প্রতিস্থাপিত করে আইপিসি সংশোধন করা হয়েছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অবশ্য এর চেয়েও আরও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে বলে মনে হয়।

(নির্ভরকৃত সূত্র: নিশান্ত গোখলে লিখিত *Life Imprisonment in India: A Short History of a Long Sentence*)

(বিবেচ্য বিষয়টি হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ ছাড় ও ক্ষমাসহ বা ছাড়া দোষী ব্যক্তির জীবনের শেষ অবধি কিনা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কত দীর্ঘ হতে পারে।)

১৪৯ টি দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কঠোরতম শাস্তি। কয়েকটি দেশে অপরাধের জন্য তাদের কঠোরতম শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড রয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বর্তমানে সাজা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট সময়ের পরে মুক্তির জন্য যোগ্য হন। ৬৭ টি রাষ্ট্র সংঘটিত অপরাধের শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখে। কিছু দেশে যখন কোনও ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তার অর্থ হল উক্ত ব্যক্তি তার বাকি জীবন কারাগারে কাটাবেন। কখনও কখনও, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে 'জীবনের জন্য দণ্ড' বলা হয়। যদিও নির্দিষ্ট কিছু দেশে আইনগত সুনির্দিষ্ট কিছু মাত্রা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে, সাধারণভাবে এই জাতীয় শাস্তি তাদের প্রকৃতিগতভাবে অনির্দিষ্ট। আফ্রিকার নয়টি দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ নিম্নরূপঃ

১. কেনিয়া----------জীবন

২. তানজানিয়া---------- জীবন

৩. জিম্বাবুয়ে-------- জীবন (২০১৬ সালের জুনে এটি সাংবিধানিক আদালতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, প্যারোলের সম্ভাবনা ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অসাংবিধানিক)

৪. ঘানা-------জীবন

৫. দক্ষিণ আফ্রিকা---- বন্দী তার সারাজীবন কারাবরণ করবে তবে, আইনটি একজন বন্দীকে ২৫ বছর হাজতবাস করার পরে বা তার ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর প্যারোলে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়।

৬. উগান্ডা----------২০ বছর

৭. মালাউই-------- জীবন

৮. বোতসোয়ানা---- জীবন বা অন্য কোনও সংক্ষিপ্ত সময়ের সাজা হতে পারে।

৯. মরিশাস------ জীবন

মেক্সিকোতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একটি অনির্দিষ্ট শাস্তি। এর মেয়াদ ২০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত বন্দী মারা না যাওয়া পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অব্যাহত থাকে। কখনও কখনও বন্দীর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেক বেশি সময়ের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, একাধিক হত্যার জন্য ৩০০ বছরের কারাদণ্ড। মূলত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ সর্বদা ‘‘সারাজীবনের জন্য কারাদণ্ড’’ নয়। যখন ১০ বছর বা তার বেশি সময় শেষ হয়ে যায়, দোষীকে প্যারোলে মুক্ত করা যেতে পারে।

কানাডায়-যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্যারোলসহ একটি অনির্দিষ্ট সময়ের কারাদণ্ড। প্যারোলের অযোগ্যতার সময়কাল ২৫ বছর।

মালয়েশিয়ায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ হল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যেখানে দণ্ডপ্রাপ্তদের সর্বনিম্ন ৩০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

মিয়ানমার-যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ কারাগারে পুরো জীবন যা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর অনুসারে বলা আছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সর্বনিম্ন মেয়াদ ১৪ বছর।

যুক্তরাজ্য- যুক্তরাজ্যে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' অর্থ অনির্দিষ্ট সময়ের কারাদণ্ড। অনেক ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র সচিব যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য 'ট্যারিফ' অর্থাৎ কারাবাসের মেয়াদকাল নির্ধারণ করেন। তাকে প্যারোলে মুক্ত করার আগে তাকে প্রায় ১৫ বছর সাজা ভোগ করতে হয়। ইংল্যান্ডে-যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ সারাজীবন দোষীকে কারাগারে আটকে রাখা নয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির হাজতবাসের মোট সময়কাল সাজা আদালত বা স্বরাষ্ট্র অফিস দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে (ফৌজদারি বিচার আইন ২০০৩ এর ২৬৯ ও ২৭৭ ধারার রেফারেন্স দেওয়া যেতে পারে)। যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোন আসামিকে নির্দিষ্ট সময়ের পরে মুক্তি দিতে হয়, তবে তিনি একটি লাইসেন্সের অধীনে রয়েছেন (ফৌজদারি বিচার আইন, ২০০৩ এর ২৩৮ ধারায় জারি করা হয়েছে)। ২০০৩ সালের আইনটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং মুক্তির আদেশ পর্যালোচনা করার জন্য সচিবের সাধারণ ক্ষমতা অপসারণ করেছে।

জার্মানি- ১৯৭৭ সালের আগে জার্মানির সব যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে প্যারোলের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৭৭ সালে জার্মান সাংবিধানিক আদালত আবিষ্কার করে যে, প্যারোলে সম্ভাবনা ছাড়া সকল ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বাধ্যতামূলক সাজা অসাংবিধানিক। ১৯৮১ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে প্যারোলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নিউজিল্যান্ড - ১৯৮৯ সালে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হওয়ার পর থেকে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা হয়েছে। প্যারোলের যোগ্য হওয়ার আগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের ন্যূনতম ১০ বছরের কারাদণ্ড সম্পন্ন হতে হবে।

ফ্রান্স- ফ্রান্সে, প্যারোলে যোগ্য হওয়ার আগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতকে সুরক্ষাকালীন ১৮ থেকে ২২ বছর সময় কারাবাস করতে হয়।

ইউ,এ,ই - যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সময়কাল ২৫ বছর

চীন-যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দোষী ব্যক্তি ১৩ বছর প্রকৃত সাজাভোগের পরে প্যারোলের জন্য যোগ্য হতে পারে।

তুরস্ক - যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দোষী ব্যক্তি কমপক্ষে ৩৬ বছর সাজাভোগের পরে প্যারোলের জন্য যোগ্য হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া - সর্বাধিক কঠোর ক্ষেত্রে, সাজা প্রদানকারী বিচারক একটি প্যারোল অযোগ্যতার সময়সীমা নির্ধারণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন যার অর্থ বন্দী তাদের বাকি জীবন কারাগারে থাকবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত - যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা ২৫ বছর কারাভোগ না করা পর্যন্ত শর্তাধীন মুক্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

ব্রাজিল, কলম্বিয়া, নরওয়ে, পর্তুগাল এবং স্পেনের মতো কিছু দেশে সম্প্রতি নির্দিষ্ট-মেয়াদী সাজা দিয়ে যাবজ্জীবন বা অনির্দিষ্ট মেয়াদী সাজাকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। তবে, সাধারণভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। কিছু দেশের বিচারব্যবস্থাগুলিতে ন্যূনতম একটি সাজার মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করে থাকে, যা একজন যাবজ্জীবন বন্দীকে মুক্তির জন্য বিবেচিত হওয়ার আগে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার ফৌজদারি আইনে, প্যারোল বিবেচনার আগে দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার জন্য সর্বনিম্ন ১০ বছরের এবং প্রথম ডিগ্রি হত্যার জন্য সর্বনিম্ন ২৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় একজন যাবজ্জীবন বন্দী ৬ বছর দায়িত্ব পালন করার পর প্যারোলে আসার যোগ্য হতে পারেন। প্যারোলে মুক্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য জাপান এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে ১০ বছর, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ড ১২ বছর সাজা ভোগের রয়েছে। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডে তা ১৫ বছর।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য বিচারপতি সরদার রাজা, বিচারপতি খলিলুর রেহমান রামপাওয়ার, বিচারপতি ফকির মুহাম্মদ খোকর, বিচারপতি এম. জাভেদ বাতার এবং বিচারপতি সৈয়দ তাসাদুক হোসেন জিলানী সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এবং চারটি প্রদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেলকে আইনী মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, পেনাল কোডের ৫৭ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড হিসাবে গণ্য করার বিধানটি কেবলমাত্র শাস্তির মেয়াদের গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

যা কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদণ্ডের মেয়াদের একটি অংশ হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয়। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত আরেকটি প্রশ্ন হল ক্ষমা সম্পর্কিত যা সরকার সময়ে সময়ে দোষীদের প্রদান করে এবং যা কারাগারে সাজার সময়কালের উপর প্রভাব ফেলে। *Abdul Malik V. The State reported in 2006 PLD SC-365* -এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে,

> "সংগঠিত মানবজীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই অপরাধ ও শাস্তির বিষয়টি নবী-রাসূল, সংস্কারক, বিচারক ও অপরাধমূলক বিশেষজ্ঞদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। আইনশাস্ত্রীয় ভাবে, উত্থাপিত বিষয়গুলি সময় এবং স্থানের ক্ষেত্রে বৈচিত্রময় হয়েছে এবং প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিরোধ এবং সংস্কার বা পুনর্বাসনের মত শাস্তির তত্ত্বগুলি মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে যেখানে বিপথগামী আচরণকে নিরস্ত করা, শাস্তি দেয়া, সংস্কার করা এবং ক্ষতিগ্রস্থকে সান্ত্বনা প্রদানের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা চলেছে। যেহেতু মৌলিক মানবিক উপাদানগুলো একই রকম, তাই এই সমস্যা অব্যাহত রয়েছে।"

আরও দেখা গেছে যে,

> "এটি সত্য যে, "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দটি বিশেষভাবে পাকিস্তান পেনাল কোডের মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি; কোডের ৫৭ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে, শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশ গণনা করার উদ্দেশ্যে 'জীবন' অর্থ ২৫ বছরের কারাদণ্ড হবে।"
>
> "পাকিস্তান কারাগার বিধি ১৪০ এর শিরোনাম রয়েছে "যাবজ্জীবন এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের মুক্তি"। সেখানে নিম্নলিখিত ভাবে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:- বিধি ১৪০ - (১) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেক যাবজ্জীবন বন্দীকে ন্যূনতম পনের বছরের সার্বিক কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
>
> যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত সকল বন্দির পনের বছরের কারাদণ্ডের পরে তাদের মামলা, পুলিশ মহাপরিদর্শক-এর মাধ্যমে, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪০১ অনুচ্ছেদের অধীনে বিবেচনার জন্য সরকারকে প্রেরণ করা হবে।"
>
> "পঁচিশ বছর বা তারও বেশি সময়ের কারাদণ্ডের জন্য দণ্ডিত সমস্ত বন্দীদের মামলাগুলিও তাদের পনের বছরের কারাদণ্ড পূর্ণ হওয়ার পরে পুলিশ মহাপরিদর্শক-এর মাধ্যমে সরকারের আদেশের জন্য প্রেরন করা হবে।
>
> যদিও যাবজ্জীবন নির্বাসন বলতে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য সাজাকে বোঝায়, তবুও এটি পাকিস্তান পেনাল কোডের ৫২ ধারায় থাকা বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ বছরের সময়কাল হিসাবে গৃহীত হয়েছে।"

তেমনিভাবে, *Dilawar Hussain V State case* (*2013 SCMR 1582*) মামলায় কোডের ৫৭ ধারা উল্লেখ করে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট বলেছিল যে, "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দটির অর্থ ২৫ বছরের কারাদণ্ড। পাকিস্তান কারাগার

বিধি, ১৯৭৮ এর বিধি ১৪০ এ হয়েছে যে ‘‘যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বোঝাবে এবং প্রত্যেক বন্দীকে ন্যূনতম ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে’’। পাকিস্তানে, সিআরপিসি ৪০১ ধারার অধীনে ক্ষমা বা সাজা পরিবর্তনের ধারণা কারাগারের বিধি সহ পাঠ করে দেখা যায় যে, তারপর তাকে পঁচিশ বছর সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পেনাল কোডের ৪৫ ধারা- ‘‘জীবন’’ শব্দটি মানুষের জীবনকে বোঝায়, যদি না এর বিপরীত কিছু প্রসঙ্গ থেকে প্রতীয়মান হয়। জীবনের শারীরবৃত্তীয় সংজ্ঞা হল, এটি একটি ব্যবস্থা যা খাওয়া, বিপাকীকরণ, উদ্দীপনা, শ্বাস, চলন, প্রজনন এবং বাহ্যিক উদ্দীপনাগুলিতে সাড়া দেওয়ার মতো কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম। *Black’s Law Dictionary* অনুসারে, জীবনের অর্থ হল প্রাণী, মানুষ এবং উদ্ভিদ বা সংগঠিত সত্তার অবস্থা। ‘‘জীবন’’ -এর সংজ্ঞায় ‘‘যদি না এর বিপরীত কিছু প্রসঙ্গ থেকে প্রতীয়মান হয়’’ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে যদি না পেনাল কোড থেকে ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় তা বোঝাতে। অর্থাৎ, পেনাল কোডে ‘‘জীবন’’ শব্দটি কোনও ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান না হলে এটি একজন মানুষের জীবন হিসাবে গণ্য হবে। জীবনের এই সংজ্ঞা নমনীয়। পেনাল কোডের মধ্যে জীবন শব্দটি সংজ্ঞায়িত করতে আইনসভা অনবহিত ছিলেন না। ধারা ৫৭ এর মতো আরও কিছু বিধানে আইনসভা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ‘‘জীবন’’-কে সংজ্ঞায়িত করে এবং একইরকম নমনীয় সংজ্ঞা দেয়। পেনাল কোডের ৫৭ ধারাটি একটি বিবেচ্য বিধান এবং এখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভগ্নাংশ গণনা করার উদ্দেশ্যে ‘‘যাবজ্জীবন কারাদণ্ড’’-কে ৩০ বছর কারাদণ্ড হিসেবে গণনা করা হয়েছে। পেনাল কোডের ৫৭ ধারার অধীনে সকল উদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ ৩০ বছরের কারাদণ্ড নয় বরং শুধুমাত্র ভগ্নাংশের গণনার উদ্দেশ্যে। অন্যান্য উদ্দেশ্যে যেখানে গণনার প্রয়োজন হয়, কীভাবে এই গণনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, পেনাল কোডের ৬৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি অপরাধটি কারাদণ্ডের পাশাপাশি জরিমানাসহ শাস্তিযোগ্য হয়, আদালত যে মেয়াদের জন্য জরিমানা প্রদানের খেলাপি হলে অপরাধীকে কারাবন্দি করার নির্দেশ দেয়, তাহলে সেই মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য সর্বাধিক হিসেবে আইনে নির্ধারিত কারাদণ্ডের মেয়াদের এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করবে না। ধারা ৫১১ এর বিধানে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানযোগ্য অপরাধ করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্ধেক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। পেনাল কোডের ১১৬, ১১৯ এবং ১২০ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রেও অভিন্ন বিধান দেয়া আছে।

যখন কোনও অপরাধী স্বেচ্ছায় কোনও খারাপ কাজ করে, তখন এর বিনিময় তাকে একইভাবে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। এটি ধারণা করতে হবে যে, একবার অপরাধী কোনও মন্দকাজ করে ফেললে সে তার উপর শাস্তি প্রয়োগের পথ প্রশস্ত করে। প্রাচীন কাল থেকেই মানব সভ্যতা তার জনগণের আদর্শভাবে অনুসরণ করার জন্য নিয়মকানুনের বিকাশ করে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখছে। অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া বা তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ফৌজদারি বিচার প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাজাটির মূল উদ্দেশ্য অভিযুক্তকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তিনি এমন একটি কাজ করেছেন যা কেবলমাত্র তিনি যে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই সমাজের জন্য ক্ষতিকারক তা নয়, বরং তিনি ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজের সদস্য হিসাবে তার নিজের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকারক।

মামলায় সবচেয়ে উপযুক্ত সাজা বাছাইয়ের বিষয়ে বিচারকের জন্য কোনও নির্দেশনা দেওয়া নেই। সাজা প্রদানের নির্দেশিকার অনুপস্থিতির কারণে ব্যপক ইচ্ছাধীনতা ব্যবহারের সুযোগ থাকে, যা শেষ পর্যন্ত সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে অনিশ্চিতায় পর্যবসিত হয়। সাজা প্রদানের নীতিমালার জন্য একটি বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা প্রয়োজন। একইভাবে,

উপযুক্ত সাজা দেওয়ার চ্যালেঞ্জিং কাজটি সঠিকভাবে করতে আইনী কাঠামো প্রয়োজন। বিচার বিভাগ প্রতিরোধ, আনুপাতিকতা এবং পুনর্বাসন -এর মত কিছু নীতিমালা জারি করেছে যা সাজা দেওয়ার সময় বিবেচনা করা প্রয়োজন। আনুপাতিকতা নীতিতে মিটিগেটিং এবং অ্যাগ্রাভেটিং পরিস্থিতির মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নীতিগুলি আরোপযোগ্যতা প্রতিটি মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। নির্দেশনামূলক বিবেচ্য বিষয় হল এই যে, শাস্তি অবশ্যই আনুপাতিক হতে হবে। সাজা প্রদানের বিবেচ্য বিষয়ের উপর নির্দেশনাবিহীন ইচ্ছাধীনতা আইনের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজাসমূহকে নিয়ন্ত্রিনহীনতা এবং বিশাল বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে। আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, যা একজন ব্যক্তিকে জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত, ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধমূলক বা শাস্তিমূলক আটকের বিষয়টি অবশ্যই মানবিক হতে হবে। এখনও বিচারিক চিন্তায় শাস্তির মূল লক্ষ্য অবশ্য সমাজের সুরক্ষা এবং সাজার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অন্যান্য বিষয়গুলি প্রায়শই গৌণ হিসেবে বিবেচিত হয়। শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অভিযুক্তরা কম শাস্তি পেলে সমাজ ও বিচার ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। অপরাধের জন্য সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিশ্লেষণ করতে হবে যথা: অপরাধ পরীক্ষা, অপরাধী পরীক্ষা এবং তুলনামূলক আনুপাতিকতা পরীক্ষা।

আইনসভা অপরাধগুলিকে পর্যাপ্ত স্পষ্টতার সাথে সংজ্ঞায়িত করে এবং শাস্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে এবং সেই সীমার মধ্যে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকের বিস্তৃত ইচ্ছাধীনতা থাকার বিধান আইনে অনুমোদিত। প্রতিটি মামলায় প্রকাশিত অ্যাগ্রাভেটিং ও মিটিগেটিং বিষয়াবলীর ভারসাম্য বজায় রেখে বিচারককে উপযুক্ত সাজা কী হবে তা ন্যায়বিচারের সাথে নির্ধারণ করতে হবে। পর্যাপ্ত সাজা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, অপরাধের প্রকৃতি, তা সংঘটনের পরিস্থিতি, অপরাধীর বয়স এবং চরিত্র, ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতি, অপরাধী অভ্যাসগত, নৈমিত্তিক বা পেশাদার কিনা, অপরাধীর উপর শাস্তির প্রভাব, বিচারের বিলম্ব এবং দীর্ঘায়িত বিচারের সময় অপরাধীর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ, অপরাধীর সংশোধন ও সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া - এমন অনেক কারণ রয়েছে যা আদালতকে বিবেচনায় নিতে হবে। এই কারণগুলি ছাড়াও, শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের সময় ভুক্তভোগীর উপর অপরাধের প্রভাবও বিবেচনায় নিতে হবে, কারণ শাস্তি প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভুক্তভোগীর প্রতি ন্যায়বিচার করা। একটি যুক্তিযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সাজা দেওয়ার জন্য বর্তমান সিস্টেমের বেশ কয়েকটি ঘাটতি নিবারণ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান এর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস করে। অন্যদিকে, একটি অযৌক্তিকভাবে কম সাজা ন্যায়বিচারহীনতার দিকে নিয়ে যায় এবং ফৌজদারি বিচার প্রশাসনের কার্যকারিতা নিয়ে জনগণের আস্থা হ্রাস করে। সাজা প্রক্রিয়া যেখানে কঠোর হওয়া উচিত সেখানে তাই হওয়া দরকার এবং যেখানে করুণার প্রয়োজন রয়েছে সেখানে তাই দেখানো উচিত, অন্যথায় জাস্ট ডেসার্টস নীতি থেকে সরে গেলেই অন্যায় ঘটে (*State of Punjab V. Rakesh Kumer, AIR 2009 SC 891*)। অপরাধতত্ত্বে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করা হয়: প্রতিশোধমূলক, পুনর্বাসনমূলক, প্রতিরোধমূলক এবং অক্ষমকরণ। বিচারপতি কৃষ্ণা আইয়ার পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, সাজা দেওয়া একটি শেষ উপায়, সামাজিক বিপজ্জনক আচরণের অপরাধীকে নিরাময়ের জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক-শারীরিক প্রতিকার এবং তাই দণ্ডপ্রদানের কৌশলটি হওয়া উচিত অপরাধীর প্রতি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানের ছদ্মবেশে থাকা সংবেদনশীলতা এবং অপরাধীর প্রতি ভীতিকর-পীড়াদায়ক পদ্ধতি ভিত্তিক স্যাডিস্ট আচরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, যা বিচারিক নির্দয়তার নিম্নতম প্রকাশ, যদিও সম্ভবত সমাজকে আরও অপরাধ থেকে রক্ষা করার প্রতিরোধক হিসাবে এটি আরোপিত

হয়। (*Krishna Iyer J. perspectives in criminology, law and social change.*)। ফৌজদারি আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব এবং যেভাবে অপরাধটি করা হয় তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উপযুক্ত, পর্যাপ্ত, ন্যায় এবং আনুপাতিক শাস্তি আরোপ করা। লর্ড ডেনিং 'মৃত্যুদণ্ড' বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের উপস্থিত হয়ে বলেন যে, গুরুতর অপরাধের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয় তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মনোভাব পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। শাস্তির উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধ বা সংস্কার বা নিবারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বিবেচনা করা একটি ভুল।

দেশের বর্তমান ফৌজদারি আইন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ফাঁকফোকর রয়েছে যা পূরণ করা দরকার যাতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করা যায়। অনেক ফৌজদারি আইনে অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় অপরাধীর উপর কি পরিমাণ সাজা দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণের বিষয়টি আদালতের ইচ্ছাধীনে রেখে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান সম্পর্কিত পেনাল কোডের কিছু বিধান লক্ষ্য করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ: (ক) যে সকল অপরাধ কেবলমাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য, যেমন ঠগ (ধারা ৩১১), (খ) অস্বাভাবিক অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি (ধারা ৩৮৮) ইত্যাদি। একইভাবে, ফৌজদারি মামলায় সাজা দেওয়ার সময় ন্যায্যতা এবং ধারাবাহিকতা আনার জন্য আইনসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা এবং নীতিমালা প্রবর্তন করা দরকার। প্রাচীন ঔপনিবেশিক শাস্তি ব্যবস্থা অপরাধের প্রতিব্যবস্থা করার জন্য এবং কোনও বিলম্ব না করে অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করে সমাজে এর খারাপ প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত নয়। *Dananjoy Chatterjee @ Dhanu V State of West Bengal reported in* (*1994*) *2 SCC-220* মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "আজ এখানে স্বীকৃত বৈষম্য রয়েছে। কিছু অপরাধী খুব কঠোর সাজা পায়, যখন অনেকেই মূলত সমান অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন সাজা পায় এবং বিস্ময়করভাবে, বিপুল সংখ্যক অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়, যা অপরাধীদের উৎসাহিত করে এবং চূড়ান্তভাবে বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা দূর্বল করে ন্যায়বিচারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।" *Swamy Shraddananda V. State of Karnataka reported in* (*2008*) *13 SCC 767* মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে,

> "সমস্ত বড় অপরাধকে সমানভাবে কার্যকরভাবে মোকাবেলায় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অক্ষমতা এবং আদালত কর্তৃক সাজা প্রদানের প্রক্রিয়ায় অভিন্নতার অভাবের ফলে শেষ ফলাফলগুলিতে একটি স্পষ্ট ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। একদিকে, কিছু মামলা রয়েছে যেখানে এই আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদনের পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে, অনেক মামলা রয়েছে যেখানে অপরাধী একই ধরনের বা আরও ঘৃণ্যভাবে হত্যা করেও শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতের ধারাবাহিকতার অভাবে তার জীবন নিয়ে রক্ষা পেয়ে যায় বা, আরও খারাপ অবস্থায়, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে অপরাধী বিনা শাস্তিতে রেহাই পেয়ে যায়। ফলে সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ চিত্রটি সামঞ্জস্যহীন ও একতরফা হয়ে ওঠে এবং বিচারপ্রশাসন ব্যবস্থার একটি দূর্বল প্রতিফলন ফুটে ওঠে।"

যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেসকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময় নির্ধারণ একটি অপরিহার্য বিষয় এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে শাস্তি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত সংশোধন আনা জরুরী। এই আদালত মনে করেন যে, যে মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় সেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত/কয়েদীকে

কতটা সময় কারাভোগ করতে হবে তার সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা আইনসভার প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা। অন্যথায়, সংস্কারমূলক, পুনর্বাসন এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থার পদ্ধতিগুলো কেবলমাত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অন্যথায়, একজন বন্দীকে কারাগারে রাখা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর একটি আর্থিক বোঝা এবং সেই কারণে সংশোধন করে কিছু সুনির্দিস্ট শাস্তি নির্ধারণ করা জরুরি।

Gopal Vinayak Godse v. State of Maharashtra (পূর্বোল্লিখিত) -মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে সাধারণত দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য কারাদণ্ডকে বোঝায়। এই ধরণের সাজা প্রাপ্ত কোনও আসামী জেল বিধি অনুসারে তার সাজার একটি অংশ ক্ষমা পেতে পারে তবে এই ধারার অধীনে তার সম্পূর্ণ সাজা ক্ষমা করে হওয়া সরকারের আদেশ ছাড়া এই জাতীয় ক্ষমা অপরাধীকে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শেষ হওয়ার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুক্তি পাওয়ার অধিকার দেয় না। দেখা গেছে যে, প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ২০ বছরের নির্দিষ্ট সময়ের সমান ধরা হয়, তবে এই জাতীয় বন্দীর নিঃশর্তভাবে ক্ষমাসহ এই জাতীয় নির্দিষ্ট মেয়াদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে মুক্তি পাওয়ার অকাট্য কোন অধিকার নেই এবং কেবলমাত্র ক্ষমার বিধানগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই যে উক্ত সাজাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সমান করে ধরা হয়েছে, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়। *Union of India Vs. V. Sriharan Murugan & others* (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় দেখা গেছে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪৩২ ধারা অনুসারে উপযুক্ত সরকার কর্তৃক প্রদর্শিত যে কোনও ক্ষমা সাপেক্ষে একজনের জীবনের সমাপ্তি, যা উক্ত ধারার বিধান অনুসারে কার্যপন্থাগত নিয়ন্ত্রণ এবং এছাড়াও কোডের ৪৩৩ক ধারার অধীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের অধীন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ আসামির বাকি জীবনব্যাপী বা অবশিষ্ট জীবনব্যাপী কারাদণ্ড। এই জাতীয় অপরাধী সবসময়েই ভারতের সংবিধানের ১৬১ অথবা ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে বা সিআরপিসির ৪৩২ ধারার অধীনে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ এটিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচনা করতে বাধ্য থাকবে। *Maru Ram V. Union of India,* (পূর্বোল্লিখিত) মামলায়, সুপ্রীম কোর্টের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, অনিবার্য উপসংহারটি হল, যেহেতু কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪৩৩-এ ধারা কেবলমাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত এবং সেখানে দণ্ড ক্ষমা করার বিধানে কোন ফলাফল আসে না, তাই তা কোনও বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার অধিকার দিতে পারে না। অধিকন্তু, *Laxman Naskar V. State of W.B and another, reported in* (*2000*) *7 SCC 626* মামলায় *Gopal Vinayak Godse* (*Supra*) মামলার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পুনরুক্তি করেন যে, সাধারণত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা বলতে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য কারাদণ্ডকে বোঝায়*;* এই জাতীয় সাজা প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি জেল বিধি অনুসারে সাজার একটি অংশের ক্ষমা পেতে পারে, তবে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৪৩৩ ধারার অধীনে তার সাজার সম্পূর্ণ অংশ কমিয়ে উপযুক্ত সরকারের আদেশ ছাড়া এই জাতীয় ক্ষমা পুরো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আগে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য করে না। *Union of India Vs. V. Sriharan @ Murugan,* (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নটি ছিল*: Swami Shraddananda* (পূর্বোল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদালতের জন্য মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা এবং ক্ষমাবিহীন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া আইনত অনুমোদিত কিনা। *Godse* (পূর্বোল্লিখিত), *Maru Ram* (পূর্বোল্লিখিত), এবং *Ratan Singh* (পূর্বোল্লিখিত) মামলাগুলি উল্লেখ করে, সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ *Sriharan* (পূর্বোল্লিখিত) মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ব্যতিক্রমী

পরিস্থিতিতে যখন মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, তখন তা কেবলমাত্র আসামীর জীবনের বাকি সময়কালকে বোঝাবে। *Laxman Nashkar V. State of W.B. reported in* (*2000*) *7 SCC 626* মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পুনরুল্লেখ করেন যে, সাধারণত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে আসামির প্রাকৃতিক জীবনের অবশিষ্ট সময়কালের জন্য কারাদণ্ডকে বোঝাবে; এই জাতীয় সাজা প্রাপ্ত কোনও অপরাধী কারা বিধি অনুসারে তার সাজার একটি অংশ ক্ষমা পেতে পারেন, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে উপযুক্ত সরকার উক্ত অপরাধীর পুরো সাজা ক্ষমা না করলে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী হন না। সুতরাং, যেখানে *Godse* (পূর্বোল্লিখিত), *Maru Ram* (পূর্বোল্লিখিত), *and Ratan Singh* (পূর্বোল্লিখিত) -মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ একজন ব্যক্তির জীবনব্যাপী কারাবাস, সেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা প্রদানের সময় দোষী ব্যক্তিকে তার বাকি জীবন কারাগারে বন্দী রাখার নির্দেশ দিয়ে আদালত কোনও ভুল করেছে বলে বলা যায় না।

আইনের অবস্থানটি হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে সরকার কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাতিল বা হ্রাস না করা হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন বন্দী আইনত তার বাকি জীবন কারাগারে কাটাতে বাধ্য। তবে, আমরা এখানে *Maru Ram* (পূর্বোল্লিখিত) মামলার একটি অংশের কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি যেখানে বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার বন্দিত্বের হতাশার বিষয়টি উপলব্ধি করতে, অস্কার ওয়াইল্ড লিখিত "*The Ballad of Reading Gaol*" কবিতা থেকে কিছু পঙক্তি উল্লেখ করা উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন।

কবি বলেন:

> "আমি জানি না আইনগুলি সঠিক কিনা,
> অথবা আইনগুলি ভুল কিনা,
> আমরা যারা জেলে আছি
> তারা সবাই জানি যে, এর প্রাচীর শক্তিশালী;
> আর প্রতিটি দিন এক বছরের মতো,
> এমন এক বছর যার প্রতিটি দিন দীর্ঘ।"

এই রায়টিতে আরও উদ্ধৃত হয়েছিল:

> "আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু একটা মরে গিয়েছিল
> এবং যা মরে গিয়েছিল তা ছিল আশা।
> * * * *
> বিষাক্ত আগাছার মতোই জঘন্য কাজগুলো
> জেলের বাতাসে ভালো করে ফুটে ওঠে:
> মানুষের মধ্যে ভালো কিছু বলতে এটাই আছে"

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে বলেছে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ হচ্ছে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের অবশিষ্ট পুরো সময়কালের জন্য কারাদণ্ড। অর্থাৎ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগকারীর মুক্তির জন্য "শেষ কথাটি" রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ভারতীয় আইনসভা সম্প্রতি দণ্ড সম্পর্কিত কিছু বিধান

প্রণয়ন করেছে যা ভারতীয় পেনাল কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন -ধারা ৩৭৬এ, ধারা ৩৭৬ডি, ধারা ৩৭৬ই। এই ধারাগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:
ধারা-৩৭৬ এ মৃত্যুর কারণ বা ভুক্তভোগীর অবিচ্ছিন্ন উদ্ভিদের অবস্থার ফলস্বরূপ শাস্তি- যে কেউ, অপরাধ করে উপ-ধারা (১) বা ধারা ৩৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে এবং এই জাতীয় কমিশন চলাকালীন একটি আঘাত অনুভূত হয় যা মহিলার মৃত্যুর কারণ হয় বা মহিলাকে অবিরাম উদ্ভিদ অবস্থায় পরিণত করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে অনধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত মেয়াদ যা বিশ বছরের কম হবে না, তবে এটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে, যার অর্থ সেই ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি কারাদণ্ড বা মৃত্যুর সাথে কারাদণ্ড হতে পারে।

ধারা ৩৭৬-ডি গণ ধর্ষণ- যেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি দল গঠন করে বা একটি সাধারণ অভিপ্রায়কে সামনে রেখে অভিনয় করে ধর্ষণ করা হয়, সেই ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ধর্ষণের অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে অনধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে একটি মেয়াদে যা বিশ বছরের কম হবে না, তবে যা আয়ু পর্যন্ত বাড়তে পারে যার অর্থ সেই ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি কারাদণ্ড এবং জরিমানা;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের জরিমানা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় এবং পুনর্বাসনের জন্য ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত হইবে;

আরও প্রদত্ত যে এই ধারার অধীনে আরোপিত যে কোনও জরিমানা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

ধারা ৩৭৬-ই পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের শাস্তি- যে কাউকে এর আগে ধারা ৩৭৬ বা ধারা ৩৭৬ এ বা ধারা ১ ৩৭৬ এবি বা ধারা ৩৭৬ ডি বা ধারা ৩৭৬ ডি বা ধারা ৩৭৬ ডিডিবি এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে যে কোনও ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার অর্থ সেই ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি কারাদণ্ড বা মৃত্যুর সাথে কারাদণ্ড হতে হবে।

এই বিধানগুলিতে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' শব্দগুলির পরে 'যার অর্থ ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের পুরো সময়ের জন্য কারাদণ্ড' শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' এর অর্থ "দোষী ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য কারাদণ্ড''- ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের পূর্বাপর এই একই রকম মতামতের পরেও ভারতীয় আইনসভা "যার অর্থ সেই ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়ের জন্য কারাদণ্ড" শব্দগুলি আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা একটি নতুন ধরনের শাস্তি এবং এটি ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে।

পেনাল কোডের ৪৫ ধারা অনুসারে জীবনের অর্থ যদি জীবন না বোঝায় তাহলে পূর্বোক্ত দণ্ডের বিধান আনার প্রয়োজনীয়তা কী ছিল। অর্থ্যাৎ ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নয়। এখনও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে।

এটা কি বলা যেতে পারে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো মৃত্যুদণ্ড এবং যা একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য 'ওয়েটিং রুম'-এ বসিয়ে রাখার সমর্থক? প্যারোলে মুক্তি ব্যাতীত এই

ধরনের জীবন মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম কিছু নয় যা প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে শেষ হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠে যে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কম শাস্তি কি না?

Godse, AIR 1961 SC 600 এবং *Maru Ram (1981) 1SCC 107* মামলার সিদ্ধান্ত যা পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে Sambha J; Drishan J; (1974) 1SCC 196; Ratan Singh (1976) 3SCC; Ranjit Singh (1984) 1SCC 31; Ashok Kumer, (1991) 3SCC 498 এবং Subash Chander, (2001) 4SCC 458 মামলায় অনুসরণ করা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নিয়ে *Sriharan's case, (2016) 7SCC 1* ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ দেন যে, পেনাল কোডের ৫৩ ও ৪৫ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের একমাত্র অর্থ হচ্ছে কারাবন্দির অবশিষ্ট জীবনের জন্য কারাদণ্ড তবে তা দণ্ড হ্রাসের প্রার্থনার অধিকার ইত্যাদি সাপেক্ষে। *Vikash Yadav V State of U.P. reported in (2006) 9 SCC 541* মামলায় দণ্ডাদেশের ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যেখানে হাইকোর্ট একটি অপরিবর্তিত সময়ের দণ্ডাদেশ অর্থ্যাৎ ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারার অধীন ২৫ বছর এবং ২০১ ধারার অধীন ৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিল এবং শর্ত ছিলো যে উভয় দণ্ডাদেশ ধারাবাহিকভাবে কার্যকর হবে। ইন্ডিয়ান সুপ্রীম কোর্ট কতৃক পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয় যে, হাইকোর্ট কতৃক আপিলকারীদের উপর অপরিবর্তিত সময়ের দণ্ডাদেশ আরোপ কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নয়। এখানে সামান্য পরিবর্তন করা হয় অর্থ্যাৎ ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ২০১/৩৪ ধারার অধীন দণ্ডাদেশ একসাথে কার্যকর হবে। *Rajendra Prashad V State of U.P* মামলার অনুগামী *Dalbir Singh V. State of Panjab, (1979) 3 SCC 745* মামলায় বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণা আইয়ার এবং ডিএ দেশাই পর্যবেক্ষণ দেন যে,, কঠোরভাবে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' বলতে মানুষের পুরো জীবনের কারাদণ্ড বোঝায়; তবে বাস্তবে তা দণ্ড প্রদানকারী আদালতের ইচ্ছায় ১০ বছর থেকে ১৪ বছরের মধ্যে কারাবাসের সমান হতে পারে যা এই শর্ত সাপেক্ষ যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে যতদিন জীবন স্থায়ী হবে যেখানে অপরাধীর খুনে স্বভাবের ব্যতিক্রমী ইঙ্গিত রয়েছে এবং সমাজ তার দ্বারা সৃষ্ট অবাধ ঝুঁকি এড়াতে পারে না।

তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে বিচারিক হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ ১৫/২০/২৫/৩০/৩৫ বছরের আগে কোনও মার্জনা গ্রহণ করা যাবে না। এই পদ্ধতি আমেরিকান এবং ইংলিশ সাজা প্রদান পদ্ধতিতে প্যারোলে মুক্তির ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং বহু পুরাতন পদ্ধতি যেখানে বিচারকরা নিজেদের নিকট কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অনির্দিষ্টতা এবং অপরাধীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বন্দিদশার সম্ভাব্য ক্ষতি এই সমালোচনাকে উস্কে দেয় যে এটি একটি চূড়ান্তভাবে অসামঞ্জস্য দণ্ডাদেশ।

Union of India V. Dharam Paul মামলায় রেসপনডেন্ট ধরম পলকে পূর্বে পেনাল কোডের ৩৭৬ এবং ৪৫২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ঐ মামলায় তিনি জামিন পেয়ে মামলাকারী পরিবারের ৫ জন সদস্যকে হত্যা করেছিলেন। তারপর তাকে পেনাল কোডের ৩০২ ও ৩৪ ধারায় বিচার করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। ভারতের হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছিল।

তিনি গভর্নরের নিকট একটি জীবনভিক্ষার আবেদন করেছিলেন যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এরপর তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট জীবনভিক্ষার আবেদন করেছিলেন যা ১৩ বছর ৫ মাস পরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং সাজা কার্যকর করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে, তিনি পেনাল কোডের ৩৭৬, ৪৫৭ ধারায় খালাসের আদেশ পেয়েছিলেন। এই সন্ধিক্ষণে, তিনি রাষ্ট্রপতির দ্বারা তার জীবনভিক্ষার আবেদনের সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্বের কারণকে ভিত্তি করে একটি রিট আবেদন করেছিলেন। হাইকোর্ট বিভাগ তার রিট আবেদন গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করে। ফলে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া একটি আপিল দায়ের করে। এই আপিলে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট রেসপনডেন্ট ধরম পলকে ইতোমধ্যে তার দ্বারা কাটানো কারাবাসের সময়সহ প্রকৃত কারাবাসের মেয়াদ ৩৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর মুক্তি দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল। শচিন কুমার সিংহের মামলায়, আপিলকারী শাচিনকে পেনাল কোডের ৩৬৩, ৩৭৬ (এ), ৩০২ এবং ২০১ (২) ধারায় এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২ এর ধারা ৫ (১) (এম) ও ৬ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। জবলপুরের মধ্য প্রদেশের হাইকোর্ট শচীনের করা আপিলে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ দেন যে আলোচ্য অপরাধটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দরকার এমন অপরাধের শ্রেণিতে নাও পড়তে পারে। যাইহোক, অপরাধের গুরুতর পরিস্থিতি মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল যে সাধারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা চূড়ান্তভাবে অপর্যাপ্ত হবে। তদনুসারে, সুপ্রীম কোর্ট কোনও মার্জনা ছাড়াই ন্যূনতম ২৫ বছরের কারাদণ্ডের মাধ্যমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল।

আরও আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে ইতোমধ্যে যে সাজা খাটা হয়ে গেছে তা সমন্বয় করা হবে। *Nanda Kishore Vs. State of Madhya Pradesh* মামলায় আপিলকারীকে পেনাল কোডের ৩০২,৩৬৩,৩৬৬, এবং ৩৭৬ (২) (i) এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল যা মধ্য প্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক বহাল রাখা হয়েছিল। আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রায় ৮ বছর বয়সী একটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ ছিল। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আপিলটি আংশিক মঞ্জুর করেছিল এবং সাজা বদলিয়ে কোনও মার্জনা ছাড়াই প্রকৃত অর্থে পচিশ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজার আদেশ দিয়েছিল। *Viran Gyanlal Rajput Vs. State of Maharastra (ICL 2018 SC 1179)* মামলার ক্ষেত্রে, আপিলকারীকে পেনাল কোডের ৩০২ এবং ২০১ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ এর ১০ ও ৪ ধারার অধীনে ১৩ বছর বয়সী মেয়েকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং হত্যার জন্য এবং প্রমাণ অদৃশ্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় অপরাধের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড আইপিসির ৩৬৬ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনের ১০ ধারায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আইপিসির ২০১ ধারায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই আইনের ১০ ধারায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় আপিলকারী নির্দোষ প্রমাণিত হন, হাইকোর্ট অন্য অপরাধের ক্ষেত্র দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজা বহাল রেখেছিল।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আপিল নিষ্পত্তি করে বলেন যে, ''যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি সংঘটিত অপরাধের

গুরুতরতার সাথে সমানুপাতিক হবে না এবং সর্বাধিক কঠোর পদ্ধতিতে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মেটাবে না। তদুপরি, যদিও আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি যে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংশোধনের সম্ভাবনা পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়নি, তবুও আমরা আপিলকারী পক্ষে অনুশোচনা এবং পুনরায় অপরাধ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিচারিক আদালত এবং হাইকোর্টের সচেতন অংশটি ভাগ করি। পরিশেষে, আপিলকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা হয়, যার মধ্যে আপিলকারী বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষমা দাবি না করে সর্বনিম্ন ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করবেন। *Amar Singh Yadav Vs. State of U.P.* মামলায় আপিলকারীকে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২, ৩০১ এবং ৪৩৬ ধারার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, আপিলকারীকে ৩০৭ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, ৪৩৬ ধারায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং আইপিসির ৩০২ ধারায় ১০০০০/- রুপি জরিমানাও করা হয়েছিল। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এই আপিল নিষ্পত্তি করে বলেন যে অভিযুক্ত অমর সিং যাদাবকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া ঠিক হয়নি। তদনুসারে, এই সাজাটিকে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করে একটি পর্যবেক্ষণ দেন যে, দ্রুত মুক্তির বিষয়টি বিবেচনার আগে তাকে ন্যূনতম ৩০ বছর জেল খাটতে হবে। *Shri Bhagwan V. State of Rajasthan, (2001) 6 SCC 296* ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হ্রাস করে নির্দেশ দিয়েছিল যে আপিলকারীকে ইতোমধ্যে কারাভোগকৃত সময়সহ কমপক্ষে ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ না করা পর্যন্ত কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। ।

Prakash Dhawal Khairnar (Patil) V. State of Maharashtra, [(2002) 2SCC 35] মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল করে নির্দেশ দিয়েছিল যে, আপিলকারীকে ইতোমধ্যে তার দ্বারা কারাভোগকৃত সময়সহ কমপক্ষে ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। *Nazir Khan and others V. State of Delhi, (2003) 8 SCC 461* মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট বলেছিল যে, এই অপরাধের গুরুতরতা এবং অপরাধের ভয়াবহ প্রকৃতি এবং প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পরিণতি বিবেচনা করলে হয়েছে তার ভয়াবহ প্রকৃতি বিবেচনা করলে এ ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২০ বছর হলে উপযুক্ত হবে। অভিযুক্ত আপিলকারীরা কোনও মার্জনা পাওয়ার অধিকারী হবে না। *Haru Ghosh V. State of West Bengal, (2009) 15 SCC* মামলায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, "আমরা আপিলকারী/অভিযুক্তকে তার সারা জীবনের কারাদণ্ডের প্রস্তাব দিচ্ছি না; তবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে আপিলকারী/অভিযুক্তর ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রকৃত কারাগারের সাজা ৩৫ বছরের কম হবে না, যার অর্থ, আপিলকারী/অভিযুক্তকে ন্যূনতম ৩৫ বছরের জন্য কারাগারে থাকতে হবে। ভারতে যখনই মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে যেখানে অভিযুক্ত অপরাধটি গুরুতর প্রকৃতির, সেখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সময় সুপ্রীম কোর্ট ন্যূনতম ২০ বছর বা ২৫ বছর বা ৩০ বছর বা ৩৫ বছর কারাদণ্ডের সময়সীমা পুনরুল্লেখ করেছে। তবে ক্ষমাসহ এই জাতীয় নির্দিষ্ট মেয়াদের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে কয়েদির নিঃশর্তভাবে মুক্তি পাওয়ার কোনও অলোপনীয় অধিকার নেই এবং এটি কেবল শাস্তি হ্রাস করা বারিত করার উদ্দেশ্যেই। কোথায় থামতে হবে তা আদালতের নিকট আরও অস্পষ্ট।

মানুষের জীবনের পুরো সময় ধরে চলা শাস্তির চেয়ে খারাপ কোনও শাস্তি হতে পারে না।

মৃত্যুদণ্ডের মামলার মতো না হয়ে, সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদে আপিল বিভাগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আপিলের বিষয়ে কোনও বিশেষ বিবেচনা পায় না যা তাদের শাস্তি হ্রাস বা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করে। সারা জীবন জেলে কাটানো, অসুস্থ ও বৃদ্ধ হওয়া এবং সেখানে মারা যাওয়া একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। এটি 'বর্ধিত মৃত্যুদণ্ড' যা আনুষ্ঠানিকভাবে হ্রাস বা ছাড়ের সাথে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হিসাবে পরিচিত। পোপ ফ্রান্সিস তার সাম্প্রতিক প্রচারপত্র "Fratelli Tutti"- তে এটিকে "গোপন মৃত্যুদণ্ড" হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, সকল বন্দির "আশার অধিকার" প্রাপ্য এবং বলেছেন, "যদি আপনি একটি কারাকক্ষে আশাকে বন্দি করে রাখেন, তাহলে সমাজের কোন ভবিষ্যৎ থাকে না"

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক এর সুবিধা পাওয়ার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কোনও দোষী অধিকারী কি না এবং যদি তিনি অধিকারী হন তাহলে কীভাবে দেওয়া হবে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কোনও আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ বা সময়সীমা কতদিন হবে অর্থ্যাৎ কীভাবে গণনা করা হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক।

মূল কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে ধারা ৩৫ক এর বিধান ছিল না। ধারা ৩৫ক প্রথমে ৫ ই মে, ১৯৯১-এ কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের আইন নং ১৬) দ্বারা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

ধারা ৩৫ক: দণ্ডপ্রাপ্তরা যে মামলায় হেফাজতে রয়েছেন-যেখানে কোনও ব্যক্তি তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সময় হেফাজতে থাকে এবং যে অপরাধের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না, সেখানে আদালত সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে থাকতে পারে কারাবাস, তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই তার হেফাজতের অবিচ্ছিন্ন সময় বিবেচনা করুন।

অর্থ্যাৎ ১৯৯১ সালের ১৬ নং আইনের অধীনে একই মামলার সাজা প্রদান করার সময় কোনও আসামির হেফাজতের ধারাবাহিক সময় বিবেচনা করা আদালতের ইচ্ছাধীন ছিল। উক্ত বিধানটি যে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় না হলে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

এরপরে, আইনসভা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের উনিশ) দ্বারা পূর্ববর্তী বিধানটি বাদ দিয়ে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে ধারা ৩৫ এ-তে একটি নতুন বিধান অন্তর্ভুক্ত করে যা নিম্নরূপঃ

> “৩৫ক। (১) কেবলমাত্র মৃত্যুর সাথে দণ্ডনীয় অপরাধের মামলা ব্যাতীত, যখন কোনও আদালত কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে, এই জাতীয় অভিযুক্তকে যে কোনও কারাদণ্ড, সাধারণ বা কঠোর মেয়াদে সাজা প্রদান করে, তা কারাদণ্ডের সাজা থেকে বাদ দেবে, এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকার সময় অভিযুক্ত ইতোমধ্যে হেফাজতে থাকতে পারে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে হেফাজতের মোট সময়সীমা যদি অভিযুক্তকে দণ্ডিত করা হয় তার কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি হয়, তবে অভিযুক্তকে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে

মুক্তি দেওয়া হবে একবারে, যদি অন্য কোনও অপরাধের সাথে জড়িত থাকার প্রয়োজন না হয় তবে হেফাজতে থাকলে; এবং যদি অভিযুক্তকে এই জাতীয় সাজা ছাড়াও কোনও জরিমানা প্রদানের সাজাও দেওয়া হয়, তবে জরিমানা মঞ্জুর করা হবে।"

ধারা ৩৫ক (১) এর বিধান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে:

(১) একজন অভিযুক্ত যিনি কোনও অপরাধের জন্য দোষী কিন্তু তার শাস্তি কেবল মৃত্যুদণ্ড নয় তিনি দণ্ডিত সাজা থেকে ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

(২) কারাদণ্ডের সাজা থেকে বিয়োজন করা আইনগত হুকুম।

(৩) আইনসভায় এ জাতীয় নতুন প্রণীত বিধানগুলি থেকে স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যখন তাদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব্যাতীত অন্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় তখন তাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পর্যালোচনাধীন রায়ে বলা হয়েছিল যে, "কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি অধিকার হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে হেফাজতে থাকা সময়ের বিয়োজন দাবি করতে পারেন না। এটি আদালতের একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। এটি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। যদিও 'কেবল' শব্দটি ধারা ৩৫ক-তে ব্যবহৃত হয়েছে, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৪০১ এবং পেনাল কোডের ৫৩ ধারা বিবেচনা না করে আইনসভায় 'কেবল' শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে তবে প্রচলিত আইনের আওতায় 'কেবল' শব্দের ব্যবহার কোনও পার্থক্য তৈরি করে না কারণ দণ্ডাদেশের ছাড়/হ্রাস কেবল সরকারের কাছে বিপরীত হয়েছে। (আমাদের দ্বারা নিম্নরেখাঙ্কিত)

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এ "কেবল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ঘটনা ছাড়া" প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল এবং "অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড" শব্দগুলি মুছে ফেলা হয়েছিল। একইভাবে, "may" শব্দটি মুছে ফেলে 'shall' শব্দটির প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে এবং এটিও সরবরাহ করা হয়েছে যে, "এটি (আদালত) কারাদণ্ডের সাজা থেকে বিয়োজন করতে হবে। প্রশ্ন হলো, সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে, পর্যালোচনাধীন মামলায় এই পর্যবেক্ষণ আইনত সঙ্গতিপূর্ণ কি না। (আমাদের দ্বারা আন্ডারলাইন করা)

"shall" শব্দের ব্যবহার একটি ধারণা তৈরি করে যে নির্দিষ্ট বিধানটি অপরিহার্য। *Sinik Motors V. State of Rajasthan (AIR 1961 SC 1480)* মামলায় জাস্টিস হেদায়েতউল্লাহ পর্যবেক্ষণ দেন যে "shall" সাধারণত বাধ্যতামূলক তবে প্রসঙ্গ বা উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু বুঝালে কখনও কখনও এটি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। *U.P.V. Babu Ram (AIR 1961 SC 751)* মামলার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ দেন যে, কোনও আইন যখন আপাতদৃষ্টিতে 'shall' শব্দটি ব্যবহার করে তখন এটি বাধ্যতামূলক হয় তবে আদালত আইনসভার আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে আইনটির পুরো বিষয় মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করে। যদি বিভিন্ন বিধান একই শব্দ 'shall'- এর সাথে সংযুক্ত থাকে এবং যদি তাদের কারও সাথে আইনসভার

উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট হয় যে, 'shall' শব্দটি অবশ্যই একটি বাধ্যতামূলক বা নির্দেশনামূলক অর্থ দেওয়া উচিত, তাহলে এটি নির্দেশ করতে পারে অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা উচিত (*Hari Vishnu Kasnath V. Ahmed Ishaque AIR 1945 SC 233*)। 'shall' শব্দটি যদি কোনও সংশোধনীর মাধ্যমে 'may' শব্দে প্রতিস্থাপিত হয়, তবে এটি একটি খুব শক্তিশালী ইঙ্গিত হবে যা 'shall' এর ব্যবহার ঐ বিধানকে অপরিহার্য করে তোলে।

আইন ব্যাখ্যার উপর ম্যাক্সওয়েলে বলা হয়েছে যে, আইনের ভাষা যদি দ্ব্যর্থবোধক হয় এবং সেই ভাষার দুটি যুক্তিসঙ্গত অর্থ থাকে তবে যে ব্যাখ্যাটি শাস্তি এড়াতে পারে তা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে, এখতিয়ার এবং পদ্ধতি সম্পর্কিত আইনগুলি যদি দণ্ডপ্রদানের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে তা কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পদ্ধতির বিধানগুলির সাথে সম্মতি দণ্ডিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে এবং যদি কোনও অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকে তবে তা তার পক্ষে যথাযথভাবে সমাধান করা হবে। ধারা ৩৫ক পদ্ধতিগত আইন হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যা অধিকার ও কর্তব্য প্রয়োগের জন্য এবং দুর্দশা লাঘবের জন্য কার্যপ্রণালী এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

ফৌজদারি আইন তার বিস্তৃত অর্থে 'মূল ফৌজদারি আইন' এবং 'পদ্ধতিগত ফৌজদারি আইন' উভয়ই নিয়ে গঠিত। মূল ফৌজদারি আইন অপরাধগুলি সংজ্ঞায়িত করে এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে যেখানে পদ্ধতিগত ফৌজদারি আইন মূল ফৌজদারি আইন পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং অপরাধী এবং আইন ভঙ্গকারীদের থেকে সমাজকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। পদ্ধতিগত আইনের অভাবে, মূল ফৌজদারি আইন খুব বেশি গুরুত্ব পাবে না কারণ প্রয়োগকারী ব্যবস্থা ব্যাতীত মূল ফৌজদারি আইন দ্বারা আইন লঙ্ঘনের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা আনুষ্ঠানিকতা এবং খালি অনুশীলন হিসাবে থাকবে। ফৌজদারী কার্যবিধি পেনাল কোডের কমপ্লিমেন্টারি এবং ফৌজদারি আইনে কার্যবিধির ব্যর্থতা মূল ফৌজদারি আইনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে। মূল ফৌজদারি আইন এর স্বভাবগত কারণে স্বপরিচালিত পারে না। পদ্ধতিগত আইনের অভাবে, মূল ফৌজদারি আইনটি প্রায় অর্থহীন হতে পারে।

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ২০০৩ দ্বারা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে ধারা ৩৫ক অন্তর্ভুক্ত করে আইনসভা কেবলমাত্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের মামলা ব্যাতীত দোষী ব্যক্তিদের হেফাজতে থাকাকালীন সময় বিয়োজনের বিধান প্রদান করেছে। আইনসভা অসাবধানতাবশত 'কেবল' শব্দটি ব্যবহার করেনি। মৃত্যুদণ্ডের দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সীমাবদ্ধ করতে 'কেবল' শব্দটি ধারা ৩৫ক ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ্যাৎ কেবল মৃত্যুদণ্ডের দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ধারা ৩৫ক এর সুবিধা পাওয়া যাবে না। এটি হলো অপরাধের একটি ক্যাটাগরি যা শুধু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়। মৃত্যুদণ্ডের দণ্ডে দণ্ডনীয় না হওয়া অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্তদের হেফাজতে থাকা মামলায় কারাদণ্ডের মেয়াদ বিয়োজনের বিধান রয়েছে।

সুতরাং, যেসব অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ও অপরাধটি কেবল মৃত্যুদণ্ডের দণ্ডে দণ্ডনীয় নয় তারা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী তাদের কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে যে সময় তদন্ত বা অনুসন্ধান বা বিচারে ব্যয় করা হয়েছিল। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক এর সুবিধা অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দোষী ব্যক্তির প্রতি সদাশয় আইনগত বিধানের

বাধ্যতামূলক ব্যবহার প্রত্যাহার করা। জনাব আরিফ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৯৭ ধারার বিধানগুলি উপর্যুক্ত মতামতকে সমর্থন দেয় যে বছরের হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের একটি শেষ এবং নির্ধারণযোগ্য মেয়াদ রয়েছে । কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৯৭ ধারা মতে এক মামলায় দণ্ডিত সাজা ভোগের পরে অন্য মামলার সাজা প্রদান করা হলে তা চালানো শুরু হবে।

নির্ধারিত বছরের শর্তে যদি না প্রথম কারাদণ্ড একটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না করা যায় তাহলে দ্বিতীয় দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজা কার্যকর করা যায় না।

পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় 'জীবন' এর অর্থ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অপরাধীর প্রাকৃতিক জীবনের সবটা জুড়ে প্রসারিত। 'জীবন'-এর সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে পেনাল কোডের ৪৫ ধারাটি নমনীয়। আমরা যদি 'প্রসঙ্গটি থেকে ভিন্ন কিছু প্রতিয়মান না হওয়া পর্যন্ত' বাক্যটি একসাথে বিবেচনা করি তাহলে উল্লিখিত নমনীয়তা স্পষ্ট হবে। অন্য কথায়, অপ্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে যে আইনসভার বিভিন্ন উদ্দেশ্য পেনাল কোডের মধ্যে উপস্থিত যা 'জীবন' এর সাধারণ অর্থের বিপরীত। অর্থাৎ, পেনাল কোডের ৪৫ ধারায় “জীবন'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, 'মানুষের জীবন' তা চূড়ান্ত, শেষ এবং পরম সংজ্ঞা নয় পরবর্তী শব্দগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সেগুলো হচ্ছে, 'প্রসঙ্গটি থেকে ভিন্ন কিছু প্রতিয়মান না হওয়া পর্যন্ত'।

পেনাল কোডের ৬৫ ধারায় এই বলা হয়েছে যে, অপরাধটি যদি জেল ও জরিমানা উভয় শাস্তিযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে জরিমানা প্রদানের খেলাপি হলে আদালত অপরাধীকে কারাবরণ করার নির্দেশ দেয় যা ঐ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ নির্ধারিত কারাদণ্ডের মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করবে না। যখন কারাদণ্ড ও জরিমানা প্রদান করা তখন জরিমানা পরিশোধ না করার জন্য কারাদণ্ডের সীমা ধারা ৬৫-তে বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা যায় এবং জরিমানার জন্যও দায়ী করা যায়। যদি কোনও অভিযুক্তকে পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়, জরিমানার পরিমাণ অপরিশোধের ক্ষেত্রে, তাকে আরও একটি মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে যা হতে পারে পুরো সময়ের এক-চতুর্থাংশ বা আদালত দ্বারা নির্দিষ্টকৃত আরও কোনও কম সময়কাল।

অভিযুক্ত যদি জরিমানার পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে কীভাবে তিনি খেলাপি পরিমাণের কারণে সাজা ভোগ করবেন যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ মানে আসামির কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস অবধি হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিষয়ে জার্মান একটি শীর্ষস্থানীয় মামলায় (*45 B Verf GE 187, Decision, 21 June 1977*) জার্মান ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, কমপক্ষে কোনও একদিন তাকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া একজন ব্যক্তিকে জোর করে তার স্বাধীনতা হরণ করা রাষ্ট্রের মূল আইনে মানবিক মর্যাদার বিধানের পরিপন্থী হবে। এই উপসংহারটিই সাংবিধানিক আদালতকে এটি সন্ধান করতে পরিচালিত করেছিল যে, কারা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির পুনর্বাসনের চেষ্টা করা এবং যে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পুনর্বাসন সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজন ছিল যা মানবিক মর্যাদাকে তার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । *Vinter and others V. United Kingdom* (২০০৯-৯ জুলাই, ২০১৩ এর আবেদন নং ৬৬০৬৯) মামলায় ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের গ্র্যান্ড চেম্বার রায় দিয়েছিল যে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত অপরাধীদের মুক্তির সম্ভাবনা এবং দণ্ডাদেশের পর্যালোচনা উভয়েরই অধিকার আছে। এই দুই অধিকারের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হলো আবেদনকারীরা অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইউরোপীয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস (ইসিএইচআর) এর ৩ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই রায়টিতে দেখা গেছে যে সমস্ত বন্দিদের আরও ভাল ভবিষ্যতের জন্য কিছু আশা বজায় রাখতে সক্ষম হওয়া দরকার যেখানে তারা আবার সমাজের পূর্ণ সদস্য হতে পারে। এই রায়টি অন্তর্নিহিতভাবে স্বীকৃতি দেয় যে, আশা মানব ব্যক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গঠনমূলক দিক। শাস্তিমূলক ন্যায়বিচার সংশোধনমূলক এবং বিতরণমূলক ন্যায়বিচার উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে। সংশোধনযোগ্য মাত্রা অপরাধীকে শাস্তি প্রদান এবং ভুক্তভোগীর সাথে তার দুর্ভোগের জন্য উদ্বেগের কথা বলার মাধ্যমে অপরাধী এবং ভূক্তভোগীর মধ্যে সমতা চাওয়ার সাথে জড়িত। দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতি লাউরি অ্যাকারম্যান *S.Vs. Dodo (CCT/1/01)* মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, শুধু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে নয়, দণ্ডণীয় কারাবরোধের যে কোনও সময়কে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করার জন্য অপরাধ এবং কারাদণ্ডের সময়কালের মধ্যে আনুপাতিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান না করা অবহেলা এবং তা অস্বীকার না করা মর্যাদার কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ এমন কোনও পণ্য নয় যার দাম সংযুক্ত করা যায়; মানুষ সহজাত এবং অনির্দিষ্ট মূল্যের সৃষ্টি, তাদের নিজেরাই শেষ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, কেবল শেষ হওয়ার উপায় হিসাবে নয়'', ২০০৩ সালে কাউন্সিল অফ ইউরোপের মন্ত্রীদের কমিটি এই জাতীয় বন্দিদের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করেছিল যাতে কারাবাসের ধ্বংসাত্মক প্রভাব এড়ানো যায় এবং বন্দিদের সমাজে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণের সাম্ভাব্যতার বৃদ্ধি ও উন্নয়ন হয় এবং তারা তাদের মুক্তির পরে আইন মেনে চলতে পারে। ২০০৩ সালের শর্তাধীন মুক্তির (প্যারোল) সুপারিশের বিধানে বলা হয়েছে যে সমস্ত বন্দিদের জন্য প্যারোল বিবেচনা করা উচিত। ইউরোপীয় কারাগার বিধি জোর দিয়েছিল যে সকল দণ্ডিত বন্দিদের কারাদণ্ডের সময়কাল একটি দায়িত্বশীল এবং অপরাধ-মুক্ত জীবনযাপন করতে সক্ষম করার জন্য ডিজাইন করা উচিত। অধ্যাপক ড. জেসিকা হেনরি কার্যত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে কারাগারে ভর্তির সময় ব্যক্তির বয়স গণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ায় ভার্চুয়াল জীবনকে সংজ্ঞায়িত করতে বছরের হিসাবে সময়সীমা স্থাপনে অসুবিধা রয়েছে। এটি মনে রাখতে হবে যে কোনও অপরাধী ভিক্টিমের উপর যে কষ্ট আরোপ করেছিল তারচেয়ে বেশি ব্যথা গ্রহণ করে কিনা। একজন অপরাধী, তার প্রাকৃতিক মৃত্যু অবধি, তার মৃত্যুদণ্ডের আগে প্রতিদিন মারা যায়, তার একটি নির্দিষ্ট পরিণতির উপায় হওয়া উচিত, নিজের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত নয়। যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোর্ট *Osborn V. The Parole Board (2013 UK SC 61)* মামলায় এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছিল যে মানবিক মর্যাদার এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োজন যা সেই ব্যক্তিদের সম্মান করে যাদের অধিকারগুলি সিদ্ধান্তের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পর্যাবেক্ষণে বলা হয় যে, অনির্দিষ্টকালের দণ্ডাদেশ ভোগকারী বন্দিদের সম্ভাব্য মুক্তি বিবেচনা করার সময় এবং খোলা শর্তে তাদের সম্ভাব্য স্থানান্তর সম্পর্কে প্যারোল বোর্ডেকে প্রশ্ন করার সময় প্যারোল বোর্ডের সামনে শুনানি করতে দেওয়া মানব মর্যাদার জন্য প্রয়োজন। ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয়, বরং প্রকাশ্য ও নিঃসন্দেহে করা উচিত বলে মনে করা হয়।

আইন ব্যাখ্যার নীতিগুলি নির্দেশ করে যে একটি আইন অবশ্যই সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। যে শব্দগুলি

কেবলমাত্র একটি অর্থ দিতে সক্ষম তা অবশ্যই সেই অর্থ দিবে। সাধারণ শব্দগুলিকে অবশ্যই সাধারণ অর্থ দেওয়া উচিত। পেনাল কোডের ধারা ৪৫, ৫৩, ৫৫, ৫৭ এবং ৬৫ এর বিধানগুলি, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক, ৩৯৭, ৪০১ এবং ৪০২ এবং পেনাল কোডের এবং ফৌজদারি কার্যবিধির কিছু বিধান, দ্য প্রিজনস এ্যাক্ট এবং তার অধীনে তৈরি বিধিকে যদি আইন ব্যাখ্যার নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়কালের জন্য কারাদণ্ড চূড়ান্ত উপসংহার নয়।

বিভিন্ন ক্ষমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নির্দেশাবলী কারা আইন এবং এর অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সময়ে সময়ে বন্দীদের দেওয়া হয়। প্রিজনস আইনে থাকা বিধানগুলি কেবল পদ্ধতিগত। এই আইনের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে যে এই আইনটি আদালতের আদেশে কারারুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কিত আইনকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে। বিধিগুলি মওকুফকৃত সাজার সময়কালসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৪০১ এর অধীনে দণ্ডাদেশ মওকুফের বিষয়ে সরকারকে সক্ষম করার একটি পদ্ধতির বিধান করে।

পূর্ববর্তী বিধানটি বাতিল করে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারাতে নতুন বিধান অন্তর্ভুক্ত করার কারণে পরিস্থিতির পরিবর্তন বা সৃষ্টি করা হয়েছে এটা সরবরাহ করে যে, কেবল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত (জোর দেওয়া) অপরাধের ক্ষেত্র ব্যতীত, যখন কোনও আদালত কোনও অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে, এই জাতীয় অভিযুক্তকে যে কোনও মেয়াদে (জোর দেওয়া হয়েছে) কারাদণ্ড প্রদান করে, তখন আদালত ঐ অপরাধের সাথে সম্পর্কিত মোট কারাদণ্ডের মেয়াদ থেকে ইতোমধ্যে হেফাজতে থাকাকালীন সময়কে বাদ দিবেন। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ এর আগে প্রণীত আইন থেকে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' শব্দটি মুছে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন, ২০০৩ কার্যকর করার মাধ্যমে আইনসভা, যারা কল্পনা করেছিলেন এবং 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড'-এর শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং 'অবশ্যই বিয়োজন করবে' শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন, এর মাধ্যমে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক এর বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং দোষীদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ার জন্য তার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে; যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা যদি অধিকারী হয় তবে তারা আইনগত ছাড়ের অধিকারী।

উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বিচারাধীন বন্দি হিসাবে তার কারাবাসের সময়টিকে গণ্য করার অধিকার দেওয়া হয়। এই রিভিউতে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো আমরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা কমানোর বাধ্যতামূলক বিধিবদ্ধ বিধানের বাস্তবতা এবং ব্যবহারিক প্রভাব দেখতে ব্যর্থ হয়েছি।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সেই অনুযায়ী এ জাতীয় সুবিধা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২৯.০৫.২০১৭ তারিখের ১২/১৭ নং সার্কুলার জারি করেছে। উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:- ·

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

www.supremecourt.gov.bd

সার্কুলার নং ১২/১৭ তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৭

বিষয়ঃ **The Code of Criminal Procedure, 1898** এর 35A ধারার বিধান অনুসরণ প্রসঙ্গে।

The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারা অনুযায়ী শাস্তি কেবলমাত্র মৃত্যুদণ্ড এরুপ অপরাধ ব্যাতীত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে সশ্রম বা বিনাশ্রম যে কোনো প্রকারের কারাদণ্ড প্রদানক্রমে প্রচারিত রায় বা আদেশে আসামীর মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামী কর্তৃক কারা হেফাজতে থাকা/অবস্থানরত সময়কাল তার মোট দণ্ডের সময়কাল হতে বিয়োগ (deduct) হবে। যদি একই অপরাধের জন্য মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামীর কারা হেফাজতে থাকা/অবস্থানরত সময় মোট দণ্ডের সময়কালের অধিক হয়, তবে আসামী তার দণ্ড ভোগ সম্পন্ন করেছে বলে গণ্য হবে এবং অন্য কোনো অপরাধের কারণে কারাগারে আটক রাখার প্রয়োজন না হলে অবিলম্বে তাকে মুক্তি প্রদান করতে হবে। এরুপ ক্ষেত্রে আসামীকে যদি কারাদণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় তাহলে আসামীর উক্ত অর্থদণ্ড মওকুফ হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই আদালত ও ট্রাইব্যুনালের রায়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মোট কারাদণ্ডের সময়কাল হতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামীর কারা হেফাজতে থাকা/অবস্থানরত সময়কাল বিয়োগের বিষয়ে কোনো প্রকার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে না বা হলেও সাজা পরোয়ানায় (Conviction Warrant) তা উল্লেখ করা হচ্ছে না। ফলে কারা কর্তৃপক্ষ আসামীর দণ্ডের মোট মেয়াদ হতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামীর কারা হেফাজতে অবস্থানকালীন সময়কাল বিয়োগ করা হতে বা উক্ত সময়কাল কারাদণ্ডের মোট মেয়াদ হতে অধিক হলে আসামীকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি প্রদান করতে (যদি না অন্য অপরাধে তাকে কারাগারে আটক রাখা আবশ্যক হয়) কিংবা ক্ষেত্রমতে, কারাদণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড মওকুফ গণ্য করা হতে বিরত থাকছে, যা আইনগত বিধি বিধানের লংঘন।

৩। এমতাবস্থায়, ফৌজদারী মামলায় আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহ-কে আসামীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে কারাদণ্ড প্রদান করতঃ প্রদত্ত রায় বা আদেশে এবং সাজা পরায়ানায় কারা কর্তৃপক্ষের প্রতি The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার বিধান মতে সশ্রম বা বিনাশ্রম যে কোনো প্রকারের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মোট কারাদণ্ডের সময়কাল হতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামীর কারা হেফাজতে থাকা/অবস্থানরত সময়কাল বাদ দেওয়ার এবং উক্ত সময়কাল কারাদণ্ডের মোট মেয়াদ হতে অধিক হলে আসামীকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি প্রদান (যদি না অন্য অপরাধে তাকে কারাগারে আটক রাখা অবশ্যক হয়) ও কারাদণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড মওকুফ গণ্য করার আদেশ সুস্পষ্টভাবে রায়ে ও সাজা পরোয়ানায় উল্লেখ করার

নির্দেশ প্রদান করা গেল।

৪। সর্বোপরি The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার বিধান মতে আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের রায় বা সাজা পরোয়ানায় (Conviction Warrant) কোনো কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কারা হেফাজতে থাকা/অবস্থানরত সময় বিয়োগের (deduct) বিষয়/নির্দেশনা উল্লেখ না থাকলেও কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আইনের বিধান মতে আসামীর মোট কারাদণ্ড হতে মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামী কর্তৃক কারা হেফাজতে থাকা/অবস্থানরত সময় বাদ দিতে এবং উক্ত সময়কাল কারাদণ্ডের মোট মেয়াদ হতে অধিক হলে আসামীকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি প্রদান (যদি না অন্য অপরাধে তাকে কারাগারে আটক রাখা আবশ্যক হয়) ও কারাদণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড মওকুফ গণ্য করতে আইনত কোনো বাধা নেই।

৫। উল্লেখ্য যে, যদি একজন আসামী একই সময়ে একাধিক বিচারাধীন মামলায় আটক হয়ে কারা হেফাজতে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মামলায় আসামী কবে প্রথম গ্রেফতার হয়ে কারা হেফাজতে অবস্থান করা শুরু করেছে এবং/অথবা জামিনের শর্ত ভঙের জন্য গ্রেফতার হয়ে সময়ে সময়ে কারাগারে অবস্থান করেছে তার মোট সময়কাল প্রত্যেক মামলার মোট কারাদণ্ডের মেয়াদ হতে বিয়োগ (deduct) করতে হবে। কেননা, একজন আসামী প্রতিটি আলাদা মামলায় যে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ৩৫ক ধারায় প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করতে অধিকারী। আরও উল্লেখ্য যে, *63 DLR (AD) 18* মামলার 41 নম্বর প্যারা ও *63 DLR (2008) 363* মামলার রায়ের আলোকে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার বিধান ভূতাপেক্ষভাবে প্রয়োগযোগ্য বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৩৫ক ধারা সংযুক্তির পূর্বে যে সব মামলা দায়ের হয়ে চলমান আছে সে সব মামলার প্রত্যেক আসামী এ ধারায় প্রদত্ত সুবিধা ভোগের অধিকারী হবেন।

(আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন)

রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ।”

বাংলাদেশে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বিচারিক ও নির্বাহী আদেশের এক জটিল সংমিশ্রণে পরিনত হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত একজন যুবক একজন বৃদ্ধের চাইতে অনেক বেশি বছর কারাগারে কাটাতে পারে। অন্যদিকে একজন বয়স্ক ব্যক্তির জীবনের বাকি অংশ কারাগারে অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত অনেক বন্দীরই কারাগারে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজের উচিত যাবজ্জীবন কারাদন্ডকে মানবিকভাবে ব্যবহারের উপায় বের করা। যদি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত সকলের জন্য কারাগারের বাইরে আসার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দন্ড প্রদানে সত্যের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। কারা ব্যবস্থাপনায় আজীবন কারাদন্ডের কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যেমন- বন্দীরা বৃদ্ধ হতে থাকবে এবং এর ফলে কারাগারে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। সাধারণত বেশিরভাগ কারাবন্দী গরীব এবং দুঃস্থ হয়। সমালোচকদের মতে, সারাজীবনের জন্য কারাদন্ড প্রদানের মাধ্যমে বন্দীর মানবাধিকার অস্বীকার করা হয় কেননা এর ফলে বন্দীর মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তার

কোন আশা থাকে না। আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন শুধুমাত্র অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান অনুমোদন করে এবং প্যারোলহীন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদানকে সমর্থন করে না। মুক্তির সম্ভাবনা ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদন্ড কারা অভ্যন্তরে বন্দীকে অনির্দিষ্টকাল অবস্থানে বাধ্য করে। এর ফলে বন্দী শারীরিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ভুগতে পারে, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ হারাতে পারে, পরিচয় সংকটে ভুগতে পারে এবং এমনকি তারা আত্মহত্যার পথ ও বেছে নিতে পারে।

গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে কারাগারে জীবনযাপন করা অত্যন্ত দুর্বিষহ ব্যাপার। অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে কারা প্রকোষ্ঠে জীবন নিজেই যেন শরীর ও মনের আততায়ী। আমাদের কারাগার গুলোতে বন্দীর সংখ্যা এত বেশি যে এর মধ্যে দমবন্ধ হয়ে আসে। এখানে বন্দীদের ঘুমানোর মতো যথেষ্ট জায়গাও নেই। কারাগারে বন্দীর সংখ্যা বহুগুন বেড়ে যাওয়ায় তীব্র স্থান সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে কারাগারে বন্দীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কোন কোন কারাগারে কারা প্রকোষ্ঠে ঘুমানোর জন্য যথেষ্ট জায়গা না থাকায় বন্দীদের পালাক্রমে ঘুমাতে হয়। এর ফলে বন্দীগণের মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। এডাম গোপনিক: "The caging of America why do we lockup so many people" এ বলেছেন, যদি কেউ এক দিনের জন্যও কারাগারের মধ্যে থাকে এই অনুভূতি সে সারা জীবনেও ভুলতে পারে না। সময় থেমে যায়। তীব্র আতঙ্ক, মানসিক বৈকল্য, উদ্বেগ, বিরক্তি, ভয় সবকিছু মিশে এমন একটি কুয়াশার আবরন তৈরি করে যা প্রহরী এবং যাদেরকে পাহারা দেওয়া হয় তাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আর্ন্তজাতিক চুক্তিতে উল্লেখ আছে, বন্দীদের সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকার আছে। ভারতে কৃষ্ণা আইয়ার কমিটি পুলিশ বাহিনীতে বেশি বেশি মহিলাদের নিয়োগ করার সুপারিশ করেছিল একথা চিন্তা করে যে মহিলা ও শিশু অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি সত্য যে, সাধারণ শান্তিকামী মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এমন অপরাধের অপরাধী ছাড়া একটি সমাজে শান্তিপূর্ণ ও নির্ভয় জীবনযাপনের অধিকার মানুষের রয়েছে। একইভাবে শক্তিশালী সংস্কারমূলক একটি তত্ত্ব অনুসারে সভ্য সমাজ কেবল শাস্তিমূলক মনোভাব এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না।

সাজার পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য 'সমাজকেন্দ্রিক' হতে হবে এ সম্পর্কিত আইন অনুসরণ করার মাধ্যমে। সমাজ বিরুদ্ধ উপাদানের বিষয়ে যে কোনও ধরণের মানসিক ভয়, হুমকি, বিপদ বা নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্ত থাকার 'মৌলিক' এবং 'মানবিক' অধিকার একটি নাগরিক সমাজের রয়েছে। সমাজ বৈধভাবে প্রত্যাশা করে যে আদালত আনুপাতিকতার মতবাদ প্রয়োগ করবে এবং উপযুক্ত ও প্রতিরোধমূলক শাস্তি আরোপ করবে যা অপরাধের গুরুতরতা বিবেচনায় যথোপযুক্ত হবে। একটি মামলায় শাস্তির পরিমাপ অবশ্যই অপরাধের নৃশংসতা, অপরাধীর আচরণ এবং ভুক্তভোগীর প্রতিরক্ষামূলক এবং অরক্ষিত অবস্থার উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে আদালত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের আবেদনে সাড়া দেয়। অযথা সহানুভূতি দেখিয়ে অপর্যাপ্ত শাস্তি আরোপ করলে তা বিচার ব্যবস্থার আরও ক্ষতি করে এবং আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা কমায়। একইসাথে এটি সকলের মনে রাখতে হবে যে, ভুক্তভোগীকে ন্যায়বিচার না দিতে পারলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অসার হয়ে পড়বে।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অপরাধের শিকার ব্যক্তি একজন 'ভুলে যাওয়া মানুষ' হয়ে যেতে পারেন না। তিনিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। বিশেষ করে হত্যার ঘটনায় তাঁর পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ। সম্মান এবং জীবন হারালে তা পুনরুদ্ধার করা না গেলেও ক্ষতিপূরণ কিছুটা সান্ত্বনা অন্তত দেয়। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিজেকে প্রগতিশীল হিসাবে বিবেচনা করে। "আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং নিজের আত্মীয়দের উপর ব্যয় করার নির্দেশ দেন এবং লাম্পট্য, অন্যায় ও অবিচার থেকে বিরত থাকতে বলেন---(পবিত্র কোরান, ১৬:৯০) "---- ন্যায়বিচার ও আইনের মাধ্যম ব্যাতীত কারো জীবন কেড়ে নিও না, যা আল্লাহ পবিত্র ঘোষনা করেছেন। এভাবেই তিনি আদেশ করেন, যাতে তোমরা প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারো"--(পবিত্র কোরান ৬:১৫১)। জীবন ও মৃত্যু ঐশ্বরিক কাজ এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করার জন্য ঈশ্বরের এই কর্তৃত্ব মানবসৃষ্ট আদালতগুলোর কাছে অর্পণ করা হয়েছে।

আমরা যদি পেনাল কোডের ৪৫, ৫৩, ৫৫ এবং ৫৭ ধারার সাথে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক এবং ৩৯৭ ধারা পাঠ করি এবং উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলি বিবেচনা করি তবে দেখা যায় যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ৩০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারা আইনের অধীনে প্রণীত বিধিগুলোর প্রয়োগের মাধ্যমে একজন বন্দিকে সাধারণ, বিশেষ বা বিধিবদ্ধ ক্ষমা করা যায় এবং উক্ত ক্ষমা তার কারাবাসের মেয়াদের ক্রেডিট অনুসারে দেওয়া হয়। তবে, আদালত যদি মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি এবং অপরাধের গুরুত্ব ও তীব্রতা এবং জনসাধারণ ও সমাজের শান্তির উপর সাধারণ প্রভাব বিবেচনা করে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যে, অপরাধী তার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবে, তাহলে অপরাধী কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক- এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে না। সবচেয়ে গুরুতর ক্ষেত্রে, বাকি জীবনের জন্য এই দন্ডাদেশ আরোপ করা যেতে পারে, যার অর্থ সেই ক্ষেত্রে জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ জীবন-ই। এই ক্ষেত্রে অপরাধীদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের প্রতি অবিচার হিসাবেই গণ্য হবে। এই ক্ষেত্রে, বন্দি যে কোনও সময় মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হবে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে পরিস্থিতি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হলো: (১) অপরাধের পারিপার্শ্বিকতা; (২) আসামির পটভূমি; (৩) আসামির আচরণ; (৪) তার ভবিষ্যতের বিপজ্জনকতা; (৫) উদ্দেশ্য; (৬) পদ্ধতি এবং (৭) অপরাধের পরিমাণ। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় বিপজ্জনক অপরাধীদের মোকাবেলা করার জন্য এটি একটি সাধারণ শাস্তিমূলক কৌশল। বেন্থাম, অস্টিন, হার্ট, কেলসেন এবং আরও কিছু আইনবিদ বলেন যে, আইন প্রণয়ন বিচার বিভাগের নয়, আইনসভার কাজ। ইংল্যান্ডে, এই নীতিটি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। *Magor and St Mellons Rural District Council V. Newport Corporations [(1951) 2 All E Q 839]* মামলায় হাউজ অফ লর্ডস আপিল আদালতে লর্ড ডেনিংয়ের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছে এই বলে যে, এটি "আইনসভার ক্ষমতার নগ্ন অপব্যবহার।" সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতা পৃথক করে দেওয়া হয়েছে এবং একটি অঙ্গের উচিত নয় অন্য অঙ্গের অধিক্ষেত্রের সীমালঙ্ঘন করা, অন্যথায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রের সকল অঙ্গের মধ্যে কেবল বিচার বিভাগই এই তিনটি অঙ্গের সীমাবদ্ধতার সংজ্ঞা দিতে পারে। এই মহান শক্তি অবশ্যই বিচার বিভাগ দ্বারা পরম বিনয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রয়োগ করা উচিত। জুডিসিয়াল এক্টিভিজম কোনও অনিয়ন্ত্রিত মিসাইল নয় এবং এটি অবশ্যই বিচারিক দুঃসাহসিকতায় পরিণত হওয়া উচিত নয়। আদালতের যেকোন সিদ্ধান্তের একটি আইনবিজ্ঞান শাস্ত্রীয় ভিত্তি থাকা উচিত। একজন বিচারক রাষ্ট্রের আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নতুন আইন প্রবর্তন করতে পারেন না তবে গঠনমূলক ব্যাখ্যা

করতে পারেন এবং আইনী বিবেচনার সুযোগগুলো ব্যবহার করতে পারেন। বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের উচিত সর্বোত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আইনত আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলা। বিভক্তি ও অস্পষ্টতা দূর করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের একটি নির্দিষ্ট সময়কালের বিধান স্থির করে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আইনসভারই রয়েছে।

তবে, উন্নয়ন এবং দ্রুত পরিবর্তিত সমাজের সাথে আইন স্থির থাকতে পারে না এবং আইনকে তার নিজস্ব নীতিগুলিকে বিকাশিত করতে হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি বলা যেতে পারে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ৩০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

বিতর্ক এড়ানোর জন্য এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের উনিশ নম্বর আইন) এর অধীনে প্রদত্ত শাস্তি নিয়ন্ত্রণ/ব্যবস্থাপনা/পরিচালিত হতে হবে সংবিধানের ৪৭ (৩), ৪৭এ (১) এবং (২) এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ এবং এর অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে। উল্লিখিত আইনের অধীনে একজন দোষী ব্যক্তি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক -এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়।

ঘটনাসমূহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে রিভিউ পিটিশনটি উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাসহ নিষ্পত্তি করা হলো:

১. আপাতদৃষ্টিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনকালের অবশিষ্ট পুরো সময়কে বোঝায়।

২. যদি পেনাল কোডের ৪৫ ও ৫৩ ধারার সাথে ৫৫ ও ৫৭ ধারা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা একসাথে বিবেচনায় নেওয়া হয় তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।

৩. তবে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের উনিশ নম্বর আইন) এর অধীনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক- এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে রিভিউ আবেদনকারীকে যে সাজা দেওয়া হয়েছে তা সংশোধন করা হলো এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০০/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হলো, অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ২ (দুই) মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো।

সহৃদয় সহায়তার জন্য আমরা বিজ্ঞ এমিকাস কিউরিদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, এই বিষয়ে শুনানি চলাকালীন, তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে ২৭.০৯.২০২০ তারিখে পরলোকগমন করেন। তিনি এই মামলায় অনেক

শ্রম দিয়েছিলেন এবং আদালতকে সহায়তা করেছিলেন। এরপর, নবনিযুক্ত বিচারক জনাব ওবায়দুল হাসানকে নিয়ে বেঞ্চ পুনর্গঠন করে বিষয়টি পুনরায় শুনানি করা হয়েছিল। অতঃপর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এ এম আমিনউদ্দিন রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত কিংবদন্তি মাহবুবে আলমের সাবমিশন গ্রহণ করেছিলেন।)

বিচারপতি জনাব মির্জা হুসেন হায়দার

আমি আমার ভাই বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর দেওয়া রায় পড়েছি। আমি বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রদত্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করছি।

বিচারপতি জনাব আবু বকর সিদ্দিকী

আমি আমার ভাই বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর দেওয়া রায় পড়েছি। আমি বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রদত্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করছি।

বিচারপতি জনাব মো. নুরুজ্জামান

আমি আমার ভাই বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর দেওয়া রায় পড়েছি। আমি বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রদত্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করছি।

বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান

আমি আমার ভাই বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী এবং বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর দেওয়া রায় পড়েছি। আমি বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রদত্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করছি।

আদালতের আদেশ

রিভিউ পিটিশনটি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয়:

১. আপাতদৃষ্টিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনকালের অবশিষ্ট পুরো সময়কে বোঝায়।

২. যদি পেনাল কোডের ৪৫ ও ৫৩ ধারার সাথে ৫৫ ও ৫৭ ধারা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ক ধারা একসাথে বিবেচনায় নেওয়া হয় তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩০ বছরের কারাদণ্ডের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।

৩. তবে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের উনিশ নম্বর আইন) এর অধীনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৩৫ক- এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে রিভিউ আবেদনকারীকে যে সাজা দেওয়া হয়েছে তা সংশোধন করা হলো এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০০/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হলো, অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ২ (দুই) মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো।

প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি

বিচারপতি

বিচারপতি

বিচারপতি

বিচারপতি

বিচারপতি

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে ‘আমার ভাষা’ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।